শ্রাবণ

সূচীপত্র

১৩৬৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়

৩১ বর্ষ; ১ম সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৮৮৩ : ১৩৬৮

ভারতীয় দর্শন: মার্কসবাদী বিচার

ভবানী সেন

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস যুগযুগ ধরে যে কুয়াসায় আচ্ছন্ন ছিল তা যে বর্তমান দশকে ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নতুন নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ এই নতুন ঐতিহাসিক আলোক বাদবিতণ্ডা এবং মতভেদ থেকে মুক্ত নয়, তা না হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রগতির প্রথম লক্ষণ। ভারতীয় দর্শনের চিরাচরিত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যে চ্যালেঞ্জ উঠেছে এবং সে চ্যালেঞ্জ যে এসেছে বিজ্ঞানের দিক থেকে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে,—এই ঘটনাই প্রমাণ করছে যে আমাদের দেশে দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তর আসন্ন। এই যুগান্তকারী প্রচেষ্টায় যাঁরা অগ্রণী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের স্থান অনস্বীকার্য। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের অবদান দ্বিবিধ: প্রথমত, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁদের চিন্তায় মৌলিকতা আছে এবং যাঁরা মার্কসবাদী বিশ্লেষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করছেন—দেবীবাবু তাঁদেরই সহযাত্রী। দ্বিতীয়ত, এই নতুন মৌলিক গবেষণার ফলাফল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে তিনি যেমন বাঙালী পাঠকদের উপকার করেছেন তেমনি বাংলা সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করছেন। ভারতীয় দর্শন (১ম খণ্ড) এই দ্বিবিধ অবদানেরই অন্যতম নিদর্শন*।

*ভারতীয় দর্শন (প্রথম খণ্ড)। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাইভেট) লিমিটেড। নয় টাকা।

রক্ষণশীল মহলে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে প্রধানত তিনটি ধারণা বদ্ধমূল :

প্রথমত, ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের সরকারী প্রচার অনুসারে বৈদিক সাহিত্যই এতকাল ভারতীয় দর্শনের একক ঐতিহ্য দাবি করে এসেছে এবং বৈদিক যুগকেই বলা হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির আদিযুগ। তার ফলে সমাজে সাধারণত আর্য জাতিই ভারতীয় সভ্যতার জনক বলে গণ্য।

দ্বিতীয়ত, হিন্দুসমাজে বিবিধ মতবাদের সংঘাতে ভরপুর ইতিহাসের এক সুস্পষ্ট সন্ধান চিরকাল ধরেই পাওয়া যাচ্ছে, এ বিষয়ে কারও কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু সাংখ্য থেকে উপনিষদ পর্যন্ত সমগ্র যুগ ধরে যে সমস্ত দার্শনিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় তাকে মূলত একই অধ্যাত্মবাদের পরিচায়ক বলে গণ্য করতেই এদেশের লোক অভ্যস্ত। কাজেই অধ্যাত্মবাদকেই ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নেওয়া পণ্ডিতসমাজের রীতি।

তৃতীয়ত, বেদ-বেদান্তের চিন্তাধারাই প্রাচীন ভারতীয় সমাজের নৈতিক ঐশ্বর্যের উৎস, এই চিন্তাধারার অবক্ষয়ই ভারতীয় সমাজের অবনতির কারণ এবং এই চিন্তাধারার পুনরুদ্ধারই সামাজিক উন্নতির পথ—এই সিদ্ধান্তই রক্ষণশীল মহলের প্রধান সিদ্ধান্ত। এমনকি যাঁরা একেবারে গোঁড়া নন, প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সর্ববিধ কুসংস্কারই যাঁরা চোখ বুজে গ্রহণ করেন না এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁরা সৌভ্রাতৃত্বস্থাপনে উৎসুক, তাঁরাও এই সিদ্ধান্তের প্রভাব থেকে মুক্ত নন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের বিচারে এই তিনটি ধারণাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। বাংলা ভাষায় স্বর্গীয় মনস্বী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই সর্বপ্রথম এই ত্রিবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক আক্রমণ প্রস্তুত করেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক পণ্ডিত গর্ডন চাইল্ড-এর স্বচ্ছতর আলোকসম্পাতে বিজ্ঞানের মঞ্চ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দেবীবাবুর 'ভারতীয় দর্শন' সহজ এবং সরলভাবে এই বিষয়ে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল বাংলা ভাষায় উপস্থিত করায় তিনি দর্শন এবং ইতিহাসের বাঙালী পাঠকদের ধন্যবাদ অর্জন করেছেন।

চিরাচলিত রক্ষণশীল ধারণার বিরুদ্ধে দেবীবাবু দেখিয়েছেন—"ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র ধারা প্রবাহিত হয়েছে—প্রাকবৈদিক ও বৈদিক : তুলনায় প্রথমটির প্রভাবই গভীরতর।" এই প্রাকবৈদিক সভ্যতাই

'সিন্ধুসভ্যতা' নামে পরিচিত। সিন্ধুসভ্যতার ইতিকথা সম্বন্ধে দেবীবাবু তিনটি সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন :

"এক ॥ সিন্ধু-সভ্যতা শুধু সুপ্রাচীন নয়, সুউন্নতও ছিল—বৈদিক সাহিত্যের চেয়ে অনেক প্রাচীন এবং বৈদিক-সাহিত্যে প্রতিফলিত মানব-উন্নতির চেয়ে অনেক বেশি উন্নতির পরিচায়ক।

"দুই ॥ যাঁরা বেদ রচনা করেছিলেন তাঁরা এ সভ্যতা গ'ড়ে তোলেন নি। সিন্ধু-সভ্যতা একান্তই আর্য-পূর্ব। স্বভাবতই এ সভ্যতার স্মারকগুলির মধ্যে বৈদিক প্রভাবের বা আর্য অবদানের চিহ্ন নেই।

"তিন ॥ কিন্তু উত্তরকালে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে—বিশেষত জন-সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে—সিন্ধুযুগের ধ্যান ধারণা ও পূজা-উপাসনার সাদৃশ্য অত্যন্ত নিকট। অতএব অনুমান হয়, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুদূর সিন্ধুযুগ থেকে একটি মূলধারা প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং তার উপর বৈদিক সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই।"

সিন্ধুযুগে ভারতীয় সমাজ যে উৎপাদন-বণ্টন-সামাজিক সংগঠন ইত্যাদির দিক থেকে উন্নত ছিল এ অনুমান আজ বহু ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা সমর্থিত। এ গবেষণা আজও অসম্পূর্ণ, সুতরাং ইতিহাসের চূড়ান্ত রায় আজও স্থগিত রাখতে হবে। কিন্তু কোনো কোনো লেখক সিন্ধুসভ্যতার উন্নততর উপাদান থেকে এই ধারণা পোষণ করেন যে এই সভ্যতা প্রাকবৈদিক নয় বেদোত্তর। গবেষণারত ইতিহাস-বিজ্ঞানীদের কাছে এ ধারণা একেবারেই অপাংক্তেয় এবং অর্বাচীনসুলভ উদ্ভট কল্পনারই অন্তর্ভুক্ত। এ ধারণা যাঁরা প্রচার করেন তাঁরা পরোক্ষভাবে আর্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে জাত্যাভিমানী রক্ষণশীল প্রচেষ্টারই সহায়ক। এ বিষয়ে আর বেশি কিছু বলা অনাবশ্যক।

প্রগতিশীল ঐতিহাসিকেরা এইরূপ অনুমান করেন যে সিন্ধুসভ্যতা মূলত দ্রাবিড়-সভ্যতা এবং সভ্যতার নিম্নস্তরে অবস্থিত আর্যগণ কর্তৃক এই সভ্যতা বিধ্বস্ত হয়েছিল। পরবর্তী যুগেও এই দুই সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অগ্রগতি হয়। গর্ডন চাইল্ড, রমাপ্রসাদ চন্দ এবং অধ্যাপক কোসাম্বীর নজির উদ্ধৃত করে দেবীবাবু দেখিয়েছেন যে সিন্ধুসভ্যতা ছিল "মূলতই কৃষিনির্ভর" এবং বৈদিক সভ্যতা ছিল "মূলতই

পশুপালননির্ভর।" সিন্ধুসভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক, কিন্তু বৈদিক সভ্যতা ছিল একান্তভাবেই গ্রাম্য।

অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজ যে অপেক্ষাকৃত অবনত সমাজ কর্তৃক বিধ্বস্ত হতে পারে ইউরোপীয় ইতিহাসেও তার নজির আছে; যেমন, রোমান সভ্যতা বর্বরদের আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু কোনো সমাজ কেবলমাত্র বহিরাক্রমণে ধ্বংস হয় না, যদি না আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ববিকাশের ফলে তা বহিরাক্রণের আগেই ধ্বংসমুখী হয়। রোমান সাম্রাজ্য বর্বর আক্রমণের জন্য ধ্বংসের পথে প্রস্তুত হয়েছিল আভ্যন্তরীণ কারণে,—অর্থাৎ, দাসভিত্তিক সমাজের অবক্ষয়ের ফলে। সিন্ধু সভ্যতাও যে বহিরাক্রমণের আগেই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে অবক্ষয়িত হচ্ছিল সে সম্বন্ধেও শ্রীচট্টোপাধ্যায় পাঠকদের অবহিত রেখেছেন।

কিন্তু বহিরাক্রমণ প্রমাণ করার দিকেই তাঁর মনোযোগ সর্বাধিক, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বজনিত অবক্ষয় সম্বন্ধে দেবীবাবু খুব অল্প কথাই বলেছেন। এ বিষয়ে তথ্যের অভাব এবং গবেষণার ত্রুটি অবশ্যই তাঁর পথে অনুত্তরণীয় বাধা, কাজেই সেজন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, গবেষণার বিষয়বস্তু এবং বৈজ্ঞানিক অনুমান হিসেবেও এই বিষয়ের প্রতি একটু বেশী দৃষ্টি তাঁর কাছ থেকে দাবি করা অসঙ্গত নয়।

প্রসঙ্গক্রমে একথাও উল্লেখযোগ্য যে সিন্ধু সভ্যতা থেকে বৈদিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে দার্শনিক চিন্তাধারার যে উৎকর্ষ দেখা যায় সে সম্বন্ধেও শ্রীচট্টোপাধ্যায় কিছু কিছু আলোচনা করেছেন, কাজেই তাঁর আলোচনায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পদ্ধতি যে মোটামুটি নির্ভুলভাবে অনুসৃত হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন এই যে সিন্ধু-পূর্ব আর্যসমাজ "বর্বর" সমাজ হলেও ঋগ্বেদ রচনার সময় আর্যসমাজ নিশ্চয়ই সিন্ধুসমাজের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত, নতুবা ঋগ্বেদ কখনও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মূল্যে সমৃদ্ধ হতে পারত না। বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীচট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"অন্তত সহস্রাধিক বছর ধরে রচিত এই সুবিশাল সাহিত্যের মধ্যে একটি অত্যদ্ভুত ধারাবাহিকতাও বর্তমান ছিল। এবং একথা কল্পনা করবার অবশ্যই কোনো সুযোগ নেই যে ওই সুদীর্ঘ যুগ ধরে বৈদিক মানুষদের সমাজ-ব্যবস্থা এবং চিন্তা-চেতনাও অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকেছিল। অতএব,

ওই সুদীর্ঘ যুগে বৈদিক মানুষদের সমাজ-ব্যবস্থা এবং চিন্তা-চেতনায় যে-পরিবর্তন ঘটেছিল তারই ধারাবাহিক এবং সাহিত্যিক নিদর্শন ওই বেদ—আর কোন মানবজাতির ইতিহাসে এ-জাতীয় এমন বিস্তীর্ণ নিদর্শন অবশ্যই পাওয়া যায় না। এবং এই কারণেই প্রচীন কালের সমাজ-বিকাশ ও চিন্তা-বিকাশ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বৈদিক সাহিত্যের মূল্য সত্যিই অতুলনীয়।"

সত্য কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায়, বৈদিক সমাজের চেয়েও উন্নত সিন্ধুসভ্যতার কোনো সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের নজির কেন পাওয়া যায় না? তৎকালীন 'ধর্মবিশ্বাসের' যে নজির পাওয়া যায় তা কি বৈদিক যুগের ধর্মবিশ্বাসের চেয়ে উন্নত পর্যায়ের?

এবার ভারতীয় দর্শনের মূল ধারাগুলি সম্বন্ধে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা করা যাক।

সিন্ধুসভ্যতার সময়ই শক্তিপূজা, তান্ত্রিক সাধনা এবং সাংখ্যদর্শনের বীজ উপ্ত হয়েছিল এরকম একটি সিদ্ধান্তের সপক্ষে ঐতিহাসিক উপাদান আছে বলেই লেখকের বিশ্বাস এবং তাঁর এ বিশ্বাসের সপক্ষে পূর্বলিখিত 'লোকায়ত দর্শন'-এ তিনি যথেষ্ট তথ্য পেশ করেছেন; 'ভারতীয় দর্শন,' ১ম খণ্ডে, এ বিষয়ে সামান্য কিছু প্রাথমিক আলোচনা আছে। লেখক এই আলোচনার মধ্যে দেখিয়েছেন যে সিন্ধুসমাজ ছিল প্রধানত কৃষিপ্রধান ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। পরবর্তী আর্যসমাজ ছিল প্রধানত পশুপালনভিত্তিক এবং পিতৃতান্ত্রিক। এই দুই যুগের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা এই দুই ভিন্ন সামাজিক অবস্থার মানসিক প্রতিফলক। লেখকের এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত। সাংখ্য দর্শন বাস্তবিকই তন্ত্রের ক্রমবিকাশ কিনা অথবা তান্ত্রিক সাধনা আদৌ সিন্ধুসমাজের প্রধান অবদান কিনা এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচার ঐতিহাসিকেরাই করবেন। কিন্তু শিবশক্তির উপাসনা সিন্ধুসভ্যতায় বিদ্যমান ছিল এবং তার সঙ্গে তন্ত্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। শক্তিপূজার উৎপত্তি হয়তো মাতৃতান্ত্রিক সিন্ধুসমাজেই হয়েছিল এবং সাংখ্য দর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বৈদিক যুগেও সৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে। আবার এই দুই দর্শনের সঙ্গে তন্ত্রের প্রত্যক্ষ যোগ লাভ থাকতে পারে; এমনও হতে পারে যে সিন্ধুযুগেই হোক আর বৈদিক যুগেই হোক, সামাজিক অবক্ষয়ের একটা বিশেষ দুর্গত অবস্থায় তান্ত্রিক সাধনার উৎপত্তি। আবার, সিন্ধুসভ্যতা যতই উৎকৃষ্ট হোক, সে সমাজেও

উৎপাদন কৃষিভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও সেটা ছিল লৌহযুগের পূর্ববর্তী যুগ এবং সে সমাজের কৃষিও যে ছিল অত্যন্ত নিম্নস্তরের সে কথাও শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেছেন তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে। সুতরাং তাদের সংস্কৃতির মধ্যেও বর্বর যুগের অবশেষ ছিল, ছিল অনিয়ামক যৌনজীবন—যা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং তান্ত্রিকশাস্ত্র হয়তো বা তারই প্রতিফলক। এমন অনেক কিছু অনুমান করা যেতে পারে আবার এমন অনেক বিষয়েই শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত সঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি গবেষণা শুরু করেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক, তাঁর অনুসন্ধান নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক। প্রাচীন সামাজিক পরিবেশ বুঝবার জন্য যে সমস্ত উপাদান ব্যবহারযোগ্য তা তিনি ব্যবহার করেছেন এবং আধুনিকতম ঐতিহাসিক আবিষ্কারের সাহায্যে প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারার বাস্তবভিত্তি অনুসন্ধান করে যদি কোথাও কোনো ভুল করে থাকেন তো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাহসই তিনি দেখিয়েছেন। সুধী সমাজের সরকারী ভাষ্য নির্বিচারে মেনে না নিয়ে মৌলিক গবেষণায় ভুল করার সাহস কেউ না দেখালে বিজ্ঞানের অগ্রগতি অসম্ভব। একথা দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

এই সমস্ত স্বীকার করেও প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি সমস্যা থেকে যায়: ইতিহাসে দেখা যায় যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল সভ্যতার উন্মেষের পূর্বে, বর্বরতার নিম্নস্তরে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ উদ্ভূত হয়েছে বর্বরতার উচ্চস্তরে এবং সভ্যতার উন্মেষের সময়। অবশ্য আধুনিক আবিষ্কার অনুসারে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বিকশিত হয় এরকম সরল ধারা অনুসারে ইতিহাস সর্বত্র অগ্রসর হয় নি। কিন্তু তা হলেও সমস্যা এই যে পিতৃতান্ত্রিক আর্যসমাজের চেয়েও মাতৃতান্ত্রিক সিন্ধুসমাজ অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছিল কেন এবং কেনই বা অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর পিতৃতান্ত্রিক আর্যসমাজেই দার্শনিক চিন্তা অনেক বেশি অগ্রসর। এই সমস্যার উপর শ্রীচট্টোপাধ্যায় কোনো আলোকপাত করেন নি এবং এই সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট গবেষণা আবশ্যক। এ সমস্যা আরো জটিল হয়ে ওঠে যখন দেখি যে উপনিষদে শ্বেতকেতুর বাল্যকালেও উদ্দালকের পরিবারে মাতৃতান্ত্রিকতার অবশিষ্ট নৈতিক মূল্যবোধ বিদ্যমান। এ থেকে এরূপ অনুমানেরও কারণ আছে যে সিন্ধুতীরে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় হয়তো তা মাতৃতান্ত্রিক এবং আদিম কমিউনিস্ট সমাজ ছিল, ক্রমশ তার পরিবর্তন

ঘটেছে। তা যদি হয় তাহলে সিন্ধুতীর জয়ের সময় থেকে বৈদিক সাহিত্য রচনার কাল এই দুইয়ের ভেতর একটা বিরাট যুগের ব্যবধান থাকবার কথা। দেবীবাবু যথার্থই বলেছেন—"সুবিশাল বৈদিক সাহিত্য সুদীর্ঘ যুগের রচনা; তাই এ সাহিত্যের অংশবিশেষে এমন সুপ্রাচীন কালের স্মৃতি সংরক্ষিত হতে পারে যখনও বৈদিক সমাজের চূড়ান্ত পুরুষপ্রধান রূপ সুপরিস্ফুট হয় নি।" এ কথাও সত্য যে বৈদিক সাহিত্য রচনার বহুপূর্বে সিন্ধুতীরে আর্যদের বসতি বিস্তার হয়েছিল। তা যদি হয়ে থাকে তো এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসের আগেই আর্য নামে পরিচিত এক বর্বর যাযাবর জাতি ঐ সিন্ধুতীরেই বাস করত, তারা একেবারে বহিরাগত নাও হতে পারে। এমনকি হতে পারে না যে পরবর্তী কালে বহিরাগত পশুপালক যাযাবরগণ তাদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল?

কাজেই আদিম যুগের চিন্তাধারা কেবল সিন্ধুসভ্যতার আদিম মানুষের নয়, আর্যদেরও আদিম যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এই চিন্তাধারাই জাদুবিদ্যা নামে পরিচিত। ধর্মের উৎপত্তির আগে জাদুই ছিল অতীতকালের সামাজিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য এবং জাদু থেকেই ধর্মের বিকাশ। শ্রীচট্টোপাধ্যায় আলোচ্য পুস্তকে কতকটা ঠিকই বলেছেন যে "জাদু আর ধর্ম এক নয়", কিন্তু তিনি আবার বলেন: "অতএব জাদুবিশ্বাসের মূলে প্রাকৃতিক কার্য-কারণ সম্পর্ক সংক্রান্ত একটি আদিম ও অস্ফুট বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই দিক থেকেই মন্তব্য করা হয়েছে যে আদিম জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মের বদলে বরং বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসেরই সাদৃশ্য অনুমেয়।" তাঁর এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়; জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে যেটুকু কার্যকারণ সম্বন্ধ বর্তমান তা ধর্মবিশ্বাসেও আছে। জাদু এবং ধর্ম, উভয়েই প্রাকৃতিক পদার্থের ওপর অপ্রাকৃতিক শক্তি আরোপ করে এবং উভয় ক্ষেত্রেই ভৌতিক কার্যকারণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা পূরণ করে অন্ধবিশ্বাস। এই দিক থেকে জাদুর সঙ্গে ধর্মেরই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, বিজ্ঞান তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্ম জাদুরই ক্রমিক পরিণতি কিন্তু বিজ্ঞান তার বিরুদ্ধে একরকমের বিদ্রোহ। একদা ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সেতুর কাজ করেছিল দর্শন, আধুনিক যুগে মার্কস এবং এঙ্গেলসই দর্শনকে বিজ্ঞানে পরিণত করেন।

এই ত্রুটি সত্ত্বেও আলোচ্য পুস্তকে শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সবিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই দেখিয়েছেন যে বৈদিক এবং বেদোত্তর যুগে দর্শনের দুইটি

ধারা বিদ্যমান ছিল—একটি আস্তিক এবং অপরটি নাস্তিক্, আস্তিক মানে বেদবিশ্বাসী এবং নাস্তিক মানেই বেদবিরোধী। ঈশ্বরে বিশ্বাসীও বেদের অভ্রান্ততায় এবং অলৌকিকত্বে অবিশ্বাসী হলে নাস্তিক বলে গণ্য হয়েছে। লোকায়ত, সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক অবৈদিক বা বেদবিরোধী দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য পুস্তকের প্রথম খণ্ডে লেখক কেবল বৈদিক দর্শনের অন্তর্ভুক্ত পূর্বমীমাংসা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, অন্যান্য দর্শন সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাবে। আলোচ্য পুস্তকে লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব হল বেদ থেকে উপনিষদ পর্যন্ত ভাববাদের ক্রমবিকাশের সূত্র অনুসন্ধান। ঋগ্বেদের ভিতর অপরিস্ফুট ব্রহ্মবাদ উপনিষদে সুপরিস্ফুট "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মে" পরিণত হয় কিন্তু উপনিষদেও ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের লক্ষণ আছে। একদিকে ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি অবৈদিক দর্শন এবং অন্যদিকে উপনিষদ এই দুয়ের মধ্যে পূর্বমীমাংসা যোগসূত্র রচনা করেছে। ন্যায়-বৈশেষিক পার্থিব জগতের বাস্তবসত্তায় বিশ্বাসী কিন্তু সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। পূর্বমীমাংসা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, তার মতে ঋগ্বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থিত হয় নি।

ঋগ্বেদ থেকে উপনিষদ পর্যন্ত দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন—

"অতএব ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে ব্রহ্মের গরিমা বিরল নয়, কিন্তু তার মধ্যে ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের আভাসও নেই। কেননা ব্রহ্ম বলতে মূলতই অন্ন বা ধন, ব্রহ্মগরিমার অর্থ অন্নগরিমা বা ধনগরিমা।"

"উপনিষদের যুগেও যে বাস্তবিকই এ জাতীয় একটি আদিম বস্তুবাদ প্রচলিত ছিল—যে বস্তুবাদ অনুসারেই অন্নই পরম সত্তা বা চরম সত্য—এবং উপনিষদের ভাববাদী দার্শনিকরা যে সচেতনভাবেই মতবাদটি প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন, বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকেও তা অনুমিত হয়।"

প্রাচীন ভারতে ভাববাদের এই ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে লেখকের ধারণা বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু ঋগ্বেদেও প্রকৃতি সম্বন্ধে কল্পনার যে উৎকর্ষ দেখা যায়, যেমন উষাসূক্তে প্রভাত বর্ণনায়, তা ঠিক আদিম বস্তুবাদের সঙ্গে খাপ খায় না। ঋগ্বেদে উৎকৃষ্ট ভাবাত্মক কাব্য এবং নিঃকৃষ্ট প্রার্থনা উভয়ই বিদ্যমান। কাজেই আদিম বস্তুবাদ থেকে ভাববাদের ক্রমবিকাশ ইউরোপে যেভাবে হয়েছিল, প্রাচীন ভারতে হয়তো ঠিক সেভাবে হয় নি। আশা করি শ্রীচট্টোপাধ্যায় ভবিষ্যতে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন।

প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা

রণজিৎ দাশগুপ্ত

এক

অতীতের সত্য আবিষ্কার এবং অতীতের আলোয় বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথ-বিপথ চিনে নেওয়ার আগ্রহ মানুষের মনে স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের অতীত সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা আজও অসন্তোষজনক। অবশ্য এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র একদা যে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন তার কারণ বর্তমানে নেই। কেননা কিঞ্চিদধিক দেড়শো বৎসর ব্যেপে স্বদেশী ও বিদেশী মনীষীদের অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসা, নিরলস গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারতের বস্তুগত ও আদর্শগত জীবন সম্পর্কে বহু বৃত্তান্ত উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তথাপি একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখনো অত্যন্ত অস্বচ্ছ, নিতান্তই অসম্পূর্ণ। এই পরিস্থিতির মুখ্য কারণ যথোপযুক্ত মাল-মসলার অভাব। অনেক বিষয়েই প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, লিখিত ইতিহাসের সমর্থন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানের বিরলতাহেতু প্রাচীন ভারতীয় ইতিবৃত্তের অনুশীলন পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত। পরিণামে অনেক অনুমান সঙ্গত মনে হলেও নিশ্চিত সাক্ষ্যের অভাবে ইতিহাসের সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি পর্বের যোগসূত্র বিলুপ্ত। কিছু অনুমান শুদ্ধ কল্পনাশ্রয়ী। আবার, বহু সমস্যাই অমীমাংসিত ও দুঃসমাধেয়।

দুই

শ্রীযুক্ত দেবরাজ চানানা এ রকম একটি জটিল বিষয় সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন তাঁর নতুন প্রকাশিত গ্রন্থে *। বিষয়টি হল প্রাচীন ভারতে দাস-প্রথা। এ সম্বন্ধে আলোচনার অসুবিধা একটু বেশি। কারণ তথ্যের দৈন্য-জনিত অসুবিধা তো রয়েছেই। অধিকন্তু এক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে ভারতবিদ্যার

* Dev Raj Chanana : Slavery in Ancient India. People's Publishing House. Rs. 10·00

গবেষকদের একাংশের প্রাচীন ভারতকে মুগ্ধতার সঙ্গে আদর্শায়িত করে দেখার প্রচেষ্টা, সে-সমাজ ও ইতিহাসকে শ্রেণী ও সামাজিক সংঘাত-মুক্ত এবং ইতিহাসের সর্বজনীন নিয়মবহির্ভূত বলে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দাসপ্রথা সম্পর্কে অপক্ষপাত কল্পনা-শূন্য ইতিহাস রচনার অন্তরায়।

তবে একথা মনে করলে ভুল হবে যে, এ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ কোনো আলোচনা হয় নি। সে আলোচনা হয়েছে এবং তাতে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে দাসের প্রচলন যে ছিল সে বিষয়ে বহু ভারতবিদই একমত। এমনকি বৈদিক সমাজেও দাসশ্রমের ব্যবহার ছিল—একথা পণ্ডিতপ্রবর কানে তাঁর 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস'-এ উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এই দাসপ্রথার ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব কতখানি ছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রধানত দুটি চিন্তাধারা নজরে পড়ে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে কেম্ব্রিজ ইতিহাসমালায় অধ্যাপক এ. বি. কীথের আলোচনা থেকে জানা যায়, ঋগ্বেদ পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের কালে (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৯ম শতক—খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক) কৃষিকার্যে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে দাসদের ক্রমবর্ধমান নিয়োগ ঘটেছে। প্রসিদ্ধ জার্মান ভারততত্ত্ববিদ আর. ফিক সিদ্ধান্ত করেছেন, বৌদ্ধ যুগে বৃহৎ ভূম্যধিকারী ও ধনী বণিকমাত্রেই উৎপাদনের কাজে দাসশ্রম ব্যবহার করত।

পক্ষান্তরে, রিস ডেভিডস দম্পতির অভিমত হল, দাসদের সংখ্যা বেশি ছিল না। তাদের নিযুক্তও করা হয়েছিল প্রধানত গৃহস্থালির কাজে-কর্মে। তাদের প্রতি মালিকের আচরণও মন্দ ছিল না। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গবেষকদের মধ্যে অধ্যাপক ডি. ডি. কোশাম্বী, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের বিশ্লেষণও অনুরূপ। শ্রী এস. এ. ডাঙ্গে অবশ্য মহাভারতের সমাজে দাসপ্রথার বিস্তৃতির কথা বলেছেন। কিন্তু তিনিও ইঙ্গিত করেছেন, দাসদের প্রধানত নিয়োগ করা হত গার্হস্থ্য কাজে।

তিন

সন্দেহ নেই, ভারতসন্ধানীদের উপরোক্ত গবেষণায় প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা সম্বন্ধে বহু সত্য ধরা পড়েছে। তবু একথা মানতে হবে, এঁদের প্রায় কারুর ক্ষেত্রেই দাসপ্রথাটা আলোচনার লক্ষ্য নয়। সে আলোচনা এসে পড়েছে অন্য

কোনো বিষয়ের চর্চা প্রসঙ্গে। ফলত দাসপ্রথার বিষয়ে এঁদের বিচার-বিবেচনা অসম্পূর্ণ ও আংশিক, সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তি যথেষ্ট শক্ত নয়।

দাসপ্রথা সম্পর্কে গবেষণার এই পশ্চাৎভূমিতে শ্রীদেবরাজ চানানার গ্রন্থের প্রকাশ বিশেষভাবেই অভিনন্দনযোগ্য। এই গ্রন্থের মুখ্য বিশেষত্ব হল, এটিই প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথার বিবর্তন সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ও সুসংবদ্ধ পরিচয়দানের সর্বপ্রথম প্রয়াস। এবং শুধু দাসপ্রথা কেন, আসলে প্রাচীন ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেই এই গ্রন্থ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কোনো রকম দ্বিধা না রেখেই বলা যায়, আলোচ্য পুস্তকটি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের গবেষক ও নিয়মিত ছাত্রদের কাছেই শুধু নয়, আমাদের মতো অনধিকারী সাধারণ পাঠকবৃন্দের কাছেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমাদৃত হবে।

বৌদ্ধযুগের (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক—খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক) উত্তর-ভারত, বিশেষত মধ্যদেশ বলে কথিত অঞ্চল অর্থাৎ গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তরাংশে দাসপ্রথার বিকাশ শ্রীচানানার কেন্দ্রীয় আলোচ্যবস্তু। এ আলোচনার ভূমিকা স্বরূপ তিনি সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক সমাজ এবং মহাকাব্য দুটির কালে দাসপ্রথা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে সে বিষয়ে বিবরণ উপস্থিত করেছেন। বৌদ্ধযুগের অব্যবহিত পরেই বা দাসপ্রথায় কি কি পরিবর্তন এল সে বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে।

দাসপ্রথা সম্পর্কে শ্রীচানানা তথ্য ও বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছেন মৌলিক সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থসমূহ থেকে। অবশ্য এজন্য তিনি মুখ্যত নির্ভর করেছেন ত্রিপিটক, বিশেষত জাতকের কাহিনীসমূহের উপর। কেননা সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় পালি সাহিত্যে সমাজের আটপৌরে জীবনের সংবাদ ও বর্ণনা বিস্তর।

এ দুটি সূত্র এবং নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদির নিদর্শন থেকে গ্রন্থকার দাস-প্রথার বিষয়ে নানা খুঁটিনাটি তথ্য ও বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে, বহু সংবাদ ও ঘটনা একত্র করে সেগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থশেষে রয়েছে অতি মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জী এবং গবেষণালব্ধ ফলগুলির বিস্তারিত সূচক। এ দুটির সঙ্গে মূল আলোচনাকে একটু মিলিয়ে দেখলেই শ্রীচানানার নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আর এটি গ্রন্থকারের পক্ষে খুবই বড় কৃতিত্বের কথা যে, তিনি পূর্বনির্ধারিত কোনো সিদ্ধান্তের কাঠামোতে তথ্য-গুলিকে পুরে দেন নি। বরং তথ্যের নিরাসক্ত ও যুক্তিসহ বিচার-বিশ্লেষণেই তিনি যত্নবান। এরই ভিত্তিতে তিনি উপনীত হয়েছেন সিদ্ধান্তে। কোনো

কোনো বহুল প্রচারিত ধারণাকে খণ্ডন করেছেন সাহসের সঙ্গে। ভারতীয় সমাজপদ্ধতিতে দাসপ্রথার বিশিষ্ট স্থান সম্পর্কে করেছেন নতুন আলোকপাত।

চার

শ্রীযুত দেবরাজ চানানা প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথার ইতিবৃত্তান্ত শুরু করেছেন সিন্ধু উপত্যকার অর্ধ-ঐতিহাসিক সভ্যতার বিবরণ দিয়ে। মর্টিমার হুইলার, স্টুয়ার্ট পিগট, গর্ডন চাইল্ড প্রমুখ ভারতবিদ্যাবিদদের আলোচনার উল্লেখ করে শ্রীচানানা সিদ্ধান্ত করেছেন, উৎপাদন ব্যবস্থার বেশ কিছুটা অগ্রগতি এবং তৎসহ শ্রেণীসমাজের উদ্ভব ভিন্ন মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পার নাগরিক সভ্যতার আশ্চর্য উন্নতি ও বিকাশ সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই সমাজে দাসপ্রথার উদ্ভব ঘটেছিল কি? এ প্রশ্নের তর্কাতীত কোনো উত্তর নেই। তবে, শ্রীচানানার মতে, মিশর ও মেসোপটেমিয়ার নদী সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক চিহ্নসমূহ বিবেচনা করলে অনুমান করা সঙ্গত, সেখানে মজুরীভৃত্য কিংবা দাস (যুদ্ধ-বন্দী, ঋণ-দাস) অথবা উভয়েরই চলন ছিল। আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ শতকে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও দাসপ্রথার অবশেষ টিকে ছিল, এটা নানা কারণেই মনে হয়।

বৈদিক সমাজ সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলছেন, ঋগ্বেদে যে সমাজচিত্রটি পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যায়, শ্রমবিভাগ সবে শুরু হয়েছে, কায়িক শ্রম তখনো অবমাননাকর নয়। তবে ভারতে প্রবেশের আগেই আর্যদের মধ্যে দাসের সীমাবদ্ধ প্রচলন ছিল, একথা বেদের কোনো কোনো সূক্ত থেকে সুস্পষ্ট।

কিন্তু উৎপাদন সম্পর্কের প্রধান পরিবর্তন সূচিত হল ভারতে নবাগত আর্যদের কাছে আদি অধিবাসী কৃষ্ণকায় অনার্য 'দাস' ও 'দস্যু'দের পরাজয়ে। বিজিত কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা হয় অন্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা বিজেতা আর্যদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। কৃষ্ণকায় 'দাস' ও 'দস্যু'রা পরিণত হল আর্যদের সম্পত্তিতে—গোলামে। পরিণতিতে দাস ও গোলাম হয়ে উঠল সমার্থবাচক শব্দ। দাসেদের ভাগ্য সর্বতোভাবেই হয়ে পড়ল মালিকের মর্জির উপর নির্ভরশীল। গৃহস্থালির কাজে তো বটেই, সেই সঙ্গে গো-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, কৃষি-উৎপাদন ইত্যাদিতেও এদের নিয়োগ করা হত। তাছাড়া এরা ছিল মালিকের দান-দক্ষিণার সামগ্রী। ছান্দোগ্য উপনিষদে

তো প্রভুর বিত্তের পরিচায়ক হিসেবে গোরু, ঘোড়া, হাতি, জমি, বাড়ি, সোনা এবং স্ত্রী-দাস—এ সব কিছুকেই এক সঙ্গে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে।

বৈদিক সমাজের এই দাসপ্রথা সম্পর্কে যা বিশেষ লক্ষণীয় তা হল ঐ সমাজে মালিক ও গোলামের শ্রেণীবিভাগ মূলত আর্য ও অনার্যের ethnic বা জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্যের অনুসারী।

কালক্রমে কিন্তু প্রভু ও গোলামের এই জাতিগত পার্থক্যের সীমারেখা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। তার প্রমাণ হিসেবে আমরা রামায়ণ-মহাভারতের নায়করূপে রাম ও কৃষ্ণের উল্লেখ পাই, যাঁদের চামড়ার রং আর যাই হোক সাদা নয়। আবার, এরকম দাসের উল্লেখও পাওয়া যায় যারা কৃষ্ণকায় নয় (পৃঃ ১০৬)। মহাকাব্য দুটির সমাজে দাসের অস্তিত্ব যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তারা সম্ভবত কেবলমাত্র গৃহকর্মেই নিযুক্ত হত। তার অতিরিক্ত বিশেষ কোনো গুরুত্ব অর্জন করা দাসপ্রথার পক্ষে সেযুগে সম্ভব ছিল না।

পাঁচ

বস্তুতই সে যুগের ধন-উৎপাদন ব্যবস্থায় দাসদের স্থান ছিল গণ্ডিবদ্ধ। কেননা সেটা ছিল ব্রোঞ্জ যুগ, উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি ছিল ব্রোঞ্জ নির্মিত। এমন অবস্থায় উৎপাদনের প্রসার ও উদ্বৃত্ত সৃষ্টি এবং শ্রেণীশোষণের সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত।

লোহার ব্যবহারের শুরু আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ১০০০ শতকে। লোহার তৈরি হাতিয়ারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় উৎপাদন পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন। অরণ্যবাধা অপসারণ করে কৃষির বিস্তার হয়ে ওঠে সহজ-সাধ্য। উন্মুক্ত হয় উৎপাদন ও উদ্বৃত্তের প্রসারের সম্ভাবনা। ফলে দাস-প্রথাও হয়ে ওঠে বেশি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রক্রিয়ারই পরিণতিস্বরূপ ভারতে দাসপ্রথার সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বিকাশ ঘটে বৌদ্ধযুগে। ত্রিপিটক থেকে উপাদান সংগ্রহ করে শ্রীচানানা দেখিয়েছেন যে, তৎকালীন সমাজে দাসপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত।

এ যুগের দাসপ্রথার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, মালিক ও দাসের বিভাগ আর বৈদিক যুগের মতো জাতিগত পার্থক্যের ফল নয়। এ সমাজে দাসপতি

ও দাসদের মধ্যেকার ভেদের প্রকৃত ভিত্তি economic factors বা অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ।

অবশ্য মল্ল, ভজ্জি, শাক্য প্রভৃতি aristocratic oligarchy বা অভিজাত সাধারণতন্ত্রগুলিতে অনড় সামাজিক স্তরভেদ দানা বেঁধে উঠেছিল। এখানে ক্ষত্রিয় রাজন্য ও অভিজাতবর্গ শাসকশ্রেণী—ব্রাহ্মণ ও বণিকদের অধিকার সীমাবদ্ধ। বিশেষ বিশেষ জাতিগত লক্ষণাক্রান্ত জনগোষ্ঠী গোলাম বলে পরিগণিত। অন্যদিকে, কাশী, কোশল, মগধের রাজতন্ত্রগুলিতে সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণীবিন্যাস কিন্তু এরকম অনমনীয় ছিল না। সেখানে দাসপ্রভু ও দাসের বিভাগ নির্ধারিত হত জাতিগত ও জন্মগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে নয়, তা হত অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাবে। এবং এই শেষোক্ত প্রভাবটিই মুখ্য হয়ে ওঠে রাজতন্ত্রের কাছে অভিজাততন্ত্রের পরাজয়ে।

দাসশ্রমের ব্যবহার ছিল বিবিধ। রাজতন্ত্রে স্বাধীন নাগরিক ও ভৃত্যদের সঙ্গে গোলামেরাও সৈন্যবাহিনীভুক্ত হত। রাজপ্রাসাদে, অভিজাত পরিবারে, ধনীগৃহে, গৃহস্থালির সর্ববিধ কাজেই দাস-দাসীদের ব্যাপক নিয়োগের বহু দৃষ্টান্ত পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে রয়েছে। অন্তঃপুরিকাদের এক বিরাট অংশই ছিল দাসী। প্রভুর শয্যাসঙ্গিনী হওয়া থেকে শুরু করে সন্তানদের স্তন্যদান, গৃহ পরিচর্যা, খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন, জলতোলা ইত্যাকার নানা কাজ এরা করত। অনুরূপভাবে, দাসদের কাজও ছিল বিচিত্র ও শ্রমসাধ্য।

তবে এ যুগের দাসপ্রথা সম্পর্কে যা সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় তা হল ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধনোৎপাদনের কাজে 'দাস-কম্মকার' অর্থাৎ গোলাম ও ভৃত্যদের ব্যাপক নিয়োগ। বণিকদের ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে দাসশ্রমকে ব্যবহার করার বহু নমুনাই শ্রীচানানা উল্লেখ করেছেন।

ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ছিল কৃষি। ধনী ভূম্যাধিকারীর অস্তিত্ব ছিল গরিব ও মাঝারি চাষীর পাশাপাশি। এদের অনেকে ছিল বিপুল ভূসম্পত্তির, এমনকি হাজার হাজার 'করিস' (একর ?) জমি ও গোটা গ্রামের মালিক। এদেরই ক্ষেতে-খামারে ভৃত্য ও দাসরা কাজ করত, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে ফসল ফলাত। ব্রাহ্মণেরাও যে জমির মালিক হত এবং সেই জমির চাষে দাসদের নিযুক্ত করত, শ্রীচানানা সে অনুমান করেছেন জাতক, ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্রে উল্লিখিত নানা বিবরণ থেকে (পৃঃ ৪২, ১৫৭)।

তিনি দেখিয়েছেন, রাজন্য ও অভিজাতবর্গ, শ্রেষ্ঠী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ঐশ্বর্যের অন্যতম মূল ছিল দাসশ্রম। থেরিগাথায় 'দাসগাম' বা গোলাম অধ্যুষিত গ্রামের উল্লেখ থেকে দাসপ্রথার ব্যাপ্তি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

গৌতম বুদ্ধের জীবনকালে পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্য বিস্তারে নগরের বিকাশ ও ধনী বণিকদের শক্তিবৃদ্ধির যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে এবং তজ্জনিত জীবন ও সম্পত্তির বর্ধিত নিরাপত্তার ফলে সেই প্রক্রিয়া আরও পুষ্ট হয়। শ্রেষ্ঠী ও ভূস্বামীদের ঘটে আরও সমৃদ্ধি। কেন্দ্রীভূত শাসনের বর্ধিত ব্যয় নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই দাসশ্রম নিয়োগের সংবাদ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। রাজার খামার, কারখানা ও খনিতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়বিধ গোলাম নিয়োগের উল্লেখ রয়েছে সেখানে। দাসপ্রথা হয় আরও সংহত। ঐ একই সূত্র থেকে জানা যায়, দাসপ্রথা সংক্রান্ত নিয়মকানুনগুলি আরও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে, সেগুলির মধ্যে একটি ঐক্যসাধিত হয়। দাস সংগৃহীত হত বিবিধ উপায়ে। সংগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে ত্রিপিটকে দাসদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। আবার, অর্থশাস্ত্রে রয়েছে ন' রকম দাসের কথা—উদর-দাস, দণ্ড-প্রণিত (শাস্তিপ্রাপ্ত), ধ্বজ-হৃত (যুদ্ধবন্দী), গৃহে জাত, লব্ধ, ক্রীত ইত্যাদি।

কি সম্পর্ক ছিল দাসপ্রথার সঙ্গে বর্ণাশ্রম প্রথার ? এ বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের বিবরণাদির থেকে বোঝা যায়, মগধ সাম্রাজ্যে শূদ্ররাও আর্য হিসেবে গণ্য হত। এবং শূদ্রমাত্রই দাস, কিংবা দাসমাত্রই শূদ্র বলে বিবেচিত হত না। অবস্থাবিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরাও দাস অবস্থায় পতিত হত।

"ন হি আর্য্যস্য দাসভাব"—কৌটিল্যের এই উক্তির ভিত্তিতে কেম্ব্রিজ ইতিহাসমালায় সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, আর্যরা কখনো দাসত্ব বরণ করত না। অধ্যাপক কোশাম্বীও একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শ্রীচানানা উপরোক্ত উক্তিটির প্রসঙ্গ নির্দেশ করে বিশদ আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিপাদন করেছেন, সাধারণত আট বৎসরের কম বয়স্ক আর্যসন্তানকে দাসরূপে নিয়োগ করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা অর্থেই এই উক্তিটি করা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, এই উক্তির আপাত অর্থ ও ব্যাখ্যাটি ভ্রান্ত (পৃঃ ৮৯, ৯৯)।

বৌদ্ধযুগে দাসদের আইনগত অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা কি ছিল ? সমস্ত বিবরণের থেকেই এটা সুস্পষ্ট যে, গোলামরা ছিল অন্য যে কোনো

অস্থাবর সম্পত্তির সমতুল্য—হস্তান্তরযোগ্য এবং হাটবাজারে ক্রয়বিক্রয়ের সামগ্রী। দাস-দাসী এবং তাদের সন্তানদের জীবন ও ভাগ্য ছিল প্রচুর খেয়াল-খুশির মুখাপেক্ষী। উদয়াস্ত কঠিন পরিশ্রম, অপ্রচুর ও নিকৃষ্ট খাদ্য, নানাবিধ পীড়ন—এই ছিল দাসদের বিড়ম্বিত ভাগ্য। ক্রোধের বশে দাস-হত্যা বা দাসীর নাক-কান কেটে ফেলার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে পালি গ্রন্থাদিতে। কিন্তু এ সবের জন্য মালিকের শাস্তিবিধানের বা দাসের উপর প্রভুর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী কোনো আইন ও ব্যবস্থার উল্লেখ ত্রিপিটকে নেই।

তবে এ অবস্থার বিরুদ্ধে দাসদের অসন্তোষ ও ক্ষোভ ছিল প্রচুর। বিন পিটকে আছে, শাক্যবংশীয় মালিকদের বিরুদ্ধে দাসরা বিদ্রোহও করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত মাত্র এই একটি বিদ্রোহেরই উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এটি সম্পর্কেও তথ্য বিরল।

দাসপ্রথা সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীচানানা দেখিয়েছেন, গৌতম বুদ্ধ দাসদের প্রতি দয়ার্দ্র ও মানবিক আচরণের জন্য মালিকদের উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু কোনো মৌলিক পরিবর্তনের আভাস-মাত্রও তাঁর বাণীতে অনুপস্থিত। বরং তিনি দাসদের পরামর্শ দিয়েছেন ধৈর্য ও সততার সঙ্গে কর্তব্যসম্পাদন এবং প্রভুর প্রতি আনুগত্য রক্ষার জন্য। কোনো পলাতক দাসকে ধর্মসঙ্ঘে গ্রহণে কিংবা স্থান দানে বুদ্ধ রাজী ছিলেন না। তাছাড়া বৌদ্ধ মঠগুলিতে দাস নিয়োগ করা হত, এটাও নানা তথ্য থেকে মনে হয়। শ্রীচানানা অবশ্য এই তথ্যগুলি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি বুদ্ধদেবের উপরোক্ত মনোভাবের হেতু নিরূপণেরও প্রয়াস পেয়েছেন (পৃঃ ৬০-৬৩)।

অবশ্য যে কোনো কারণেই হোক বুদ্ধদেবের পরবর্তীকালে গোলামদের আইনগত মর্যাদার উন্নতি ঘটেছিল। নির্দিষ্ট মেয়াদের গোলাম ও আজীবন গোলামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখার কথা কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন। অর্থশাস্ত্রেই পাওয়া যাচ্ছে, দাস-দাসীদের প্রতি মালিকদের আচরণবিষয়ক নানা বিধি-নিষেধ জারীর কথা। নাবালক আর্যসন্তানকে দাসরূপে নিয়োগ করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার কথা তো একটু আগেই বলা হয়েছে। এতদ্ভিন্ন ঘৃণ্য ও নোংরা কাজে দাসদের নিয়োগ করা নিষিদ্ধ ছিল। দাসীর উপর বলাৎকার করলে সে যে মুক্তি পেত শুধু তা নয়, মালিককে জরিমানাও দিতে

হত। প্রভুর ঔরসজাত দাসী-পুত্র পেত প্রভুর আইনগত সন্তানের সব রকম অধিকার। এ রকম আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার দাস-দাসীরা পেয়েছিল মৌর্যযুগে। মুক্তিলাভের শর্তসমূহকে করা হয়েছিল শিথিল। মুক্তিমূল্য গ্রহণ করেও গোলামকে মুক্তি না দিলে মালিককে অর্থদণ্ড দিতে হত। ইত্যাকার অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় অর্থশাস্ত্রে।

দাসপ্রথার এই বিস্তৃতি ক্ষুণ্ণ হয় মৌর্য সাম্রাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে। অনেকগুলি খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের দেশজোড়া প্রসার হয় ব্যাহত, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা হয় বিপন্ন, নগরগুলির গুরুত্ব আসে কমে। স্বভাবত এই পরিস্থিতি দাসপ্রথার বিস্তারের পক্ষে অনুকূল নয়। পরবর্তীকালেও দাসের প্রচলন যে ছিল তার নমুনা পাওয়া যায় মনু ও অন্যান্য স্মৃতিকারদের রচনায়। কিন্তু দাসশ্রমভিত্তিক উৎপাদনের গুরুত্ব হ্রাস পেল। পরিবর্তে বর্ধমান গুরুত্ব লাভ করল ছোট ও মাঝারি চাষী এবং প্রজা দিয়ে জমির আবাদ।

ছয়

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই শ্রীচানানার গ্রন্থের মূল্য উপলব্ধি করা সম্ভবপর। একটি স্বল্পালোচিত জটিল বিষয়ের সম্পূর্ণ অনুশীলনের প্রয়াসে এবং অনুসন্ধানের দিগন্ত প্রসারে তাঁর সার্থকতা। সংগৃহীত তথ্য ও সিদ্ধান্তগুলি যে প্রাচীন ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা অনুধাবনে বিশেষ সহায়ক হবে তা সুনিশ্চয়।

অবশ্য শ্রীচানানার কোনো কোনো অনুমান ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন আছে। এখানে তার কয়েকটি উত্থাপন করা যেতে পারে। প্রথম কথা হল, তিনি প্রধানত পালি সাহিত্যের ভিত্তিতে বৌদ্ধযুগের সমগ্র উত্তর-ভারতের সমাজপদ্ধতিতে দাসপ্রথার ভূমিকা ও গুরুত্ব নির্ণয় করেছেন। কিন্তু তা কি সত্যিই করা যায়? ত্রিপিটকে তো প্রায় শুধুমাত্র গাঙ্গেয় উপত্যকার (তাও আবার নির্দিষ্ট অঞ্চলের) বৃত্তান্ত রয়েছে। এটা বিশেষভাবেই লক্ষণীয় যে, প্রায় একই কালে রচিত ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্রগুলিতে বর্ণাশ্রম প্রথার পক্ষেই আনা হয়েছে নানা যুক্তি ও ব্যাখ্যা, সেখানে দাসপ্রথার উল্লেখ যৎসামান্য। সূত্র সাহিত্যের রচনা-অঞ্চল যে উত্তর-পশ্চিম ভারত ও অন্ধ্র অঞ্চল তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণের অপেক্ষা রাখে।

বৌদ্ধযুগের অভিজাততন্ত্রগুলিতে বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী গোলামে পরিণত হয়েছিল—এটি শ্রীচানানার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের প্রমাণ অতি ক্ষীণ—পতঞ্জলির মহাভাষ্যে সামান্য আভাস রয়েছে। তাছাড়া সবকটি রাজতন্ত্রেই দাসপ্রথা যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করেছিল, এ সিদ্ধান্তেই বা তিনি কোন্ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উপনীত হলেন? ভূস্বামীরা অন্যকে দিয়ে জমি চাষ করাত, এ মর্মে সংবাদের থেকেই তিনি অনুমান করেছেন কৃষিতে দাসের ব্যবহার (পৃঃ ৪৩)। কিন্তু অন্যেরা যে প্রজা কিংবা ভূমিদাস নয়, গোলাম—এ অনুমানের জন্য উপরোক্ত সংবাদটিই কি যথোপযুক্ত? অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পর বন্দীদের একাংশকে দাসবাজারে পাঠানো হয়েছিল (পৃঃ ১৭৮), এ সংবাদেরই বা উৎস কোথায়?

এ সবের থেকেও গুরুতর হল শ্রীচানানার ইতিহাস রচনার রীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে প্রশ্ন। তাঁর আলোচনায় ইতিহাসের গতিছন্দকে, সমাজ-বিকাশের চঞ্চল প্রবহমান ধারাকে খুঁজে পাওয়া কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য। তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন, নানা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, কৌতূহলোদ্দীপক বহু সংবাদ পেশ করেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে সবই হয়েছে শুধু fact-এর পসরা সাজানো। অথচ এ তো জানা কথা যে fact-এর নির্বিচার পরিবেশন ইতিহাস নয়, ইতিহাস রচনার প্রথম ধাপমাত্র। নানা সংবাদের মূল্যবিচার ও ব্যাখ্যা, বিভিন্ন তথ্যের যোগসূত্র ও কার্যকারণ সম্পর্কের আবিষ্কার ইতিহাস রচনার মূল কথা। কিন্তু রচনার যে প্রসাদগুণ, ঐতিহাসিকের যে প্রশস্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, নানা তথ্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত সূত্রের যে অন্বেষণ থাকলে ইতিহাস সামগ্রিক ঐক্য ও সজীবতা লাভ করে আলোচ্য গ্রন্থে তার অভাব পীড়াদায়ক।

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে শ্রীচানানা অনেক সময়ে তথ্য এবং সে তথ্যের উৎসগুলির কালানুক্রম সম্পর্কেও উদাসীন। তিনি ঋগ্বেদের সমাজচিত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন। অথচ ঋগ্বেদ ও ছান্দোগ্য উপনিষদের রচনাকালের ব্যবধান কয়েক শতক। ত্রিপিটক গ্রথিত হয়েছে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর বেশ কিছু পরে। সুতরাং বুদ্ধের জীবনকালীন সমাজের চিত্র এতে কতখানি হয়েছে এ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কি সত্যই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে রচিত? এতে কি কেবলমাত্র তৎকালীন সমাজেরই পরিচয় আছে, না,

অন্য কোনো সমাজের বর্ণনাও প্রক্ষিপ্ত হয়েছে? আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে এ সব প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু শ্রীচানানা এ সব প্রশ্নের আলোচনা পরিহার করেছেন।

শ্রীচানানা কোথাও তাঁর ইতিহাস রচনার পদ্ধতিটিকে সুস্পষ্ট করেন নি। তবে মনে হয় তিনি ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার অনুসারী। কিন্তু এ পদ্ধতির অনুসরণ ও প্রয়োজনে তিনি যথেষ্ট নিশ্চিত নন, কিছুটা বোধহয় দ্বিধাগ্রস্ত। প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথার ন্যূনাধিক তিন হাজার বৎসরব্যাপী বিবর্তন তাঁর আলোচ্য বস্তু। কিন্তু এ বিবর্তনের অন্তর্নিহিত সূত্রটি কোথাও প্রকট নয়। ঋগ্বেদের আমলের কৌম সমাজে কেন এবং কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে দাস-প্রথার উদ্ভব ঘটল? সে যুগের দাসেরা কি গোড়াতে কৌম সম্পত্তি ছিল, না, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল? অধ্যাপক কোশাম্বী তো প্রথম সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। পরবর্তীকালে, বিশেষত বৌদ্ধযুগে, দাসপ্রথার ব্যাপ্তি ঘটল কেন? এর দ্বারা সিদ্ধ হল কোন্ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন? উপরন্তু এটা যদি সত্য হয়, বৌদ্ধযুগে দাসপ্রথার বিস্তৃতি প্রধানত গাঙ্গেয় উপত্যকায় সীমাবদ্ধ ছিল, এবং এ অনুমানের কারণ খুবই জোরালো, তবে তারই বা হেতু কোথায়? এ প্রথা উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী হাতিয়ার এবং সমাজের মানসলোকের উপর বিস্তার করল কি প্রভাব? শ্রীচানানার মতে মৌর্য সাম্রাজ্য-পরবর্তীকালে দাসপ্রথার বিস্তৃতি ক্ষুণ্ণ হয়। এর কারণ রাজনৈতিক পরিবর্তন হেতু জীবন ও সম্পত্তির অনিশ্চয়তা। কিন্তু দাসপ্রথার অস্তিত্ব প্রকৃতই ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকলে তার কারণ হিসেবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা বলা কি যথেষ্ট? কোনো অর্থনৈতিক কারণ ছিল না তো? আর মৌর্য পরবর্তী যুগে দাসপ্রথা যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল তারই বা নিদর্শন কোথায়? এ সব কোনো জিজ্ঞাসার সমাধানই আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

সর্বোপরি কথা হল, দাসপ্রথা বলতে শ্রীচানানা ঠিক কি বুঝিয়েছেন? সেটাই কি প্রাচীন ভারতীয় সমাজের, অন্তত বৌদ্ধযুগের সমাজের mode of production, সে-সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক ও আর্থিক বিধি-বন্দোবস্ত? আসলে কি সেযুগে slave society বা পুরোদস্তুর দাসসমাজেরই বিকাশ ঘটেছিল? এ সব বিষয়েও শ্রীচানানা অস্পষ্ট।

অবশ্য শ্রীচানানার সমগ্র আলোচনার থেকে প্রতীয়মান হয়, দাসপ্রথাই

প্রাচীন ভারতের কোনো পর্বে mode of production ছিল, এটা তাঁর সিদ্ধান্ত নয়। বরং তিনি বলেছেন যে, ভারতে দাসপ্রথা ব্যাপকতম বিস্তৃতির কালেও ক্লাসিকাল দাস সমাজের সমতুল্য নয়। গ্রীসে বা রোমে খনিতে, কৃষিতে, বাণিজ্যে, কারিগরী শিল্পে অর্থাৎ ধনোৎপাদনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে দাসশ্রমের যে প্রাধান্য ছিল তা ভারতবর্ষে কোনো কালে ছিল না। এ দেশে জলবায়ু মৃদু, জমি পেলব ও উর্বর, প্রকৃতির দাক্ষিণ্য অজস্র। তদুপরি বিশাল দেশে পালিয়ে গিয়ে বা বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে জীবনধারণের সুযোগও বর্তমান। সব মিলিয়ে শোষণের তীব্রতা এবং উৎপাদনের কঠোরতা ও পরিশ্রম এখানে কম।

কিন্তু দাসপ্রথা প্রাচীন ভারতের কোনো পর্বেই mode of production নয়, প্রধান উৎপাদন সম্পর্ক নয়, এই যদি শ্রীচানানার বক্তব্য হয় তবে অনিবার্যভাবেই সিদ্ধান্ত করতে হয়, সে সমাজে আর কোনো আর্থিক বিধি-বন্দোবস্ত ছিল। তাহলে সেটি কি? অনেক ভারততত্ত্বান্বেষী তো মনে করেন যে, এশিয়াটিক সামন্তপ্রথা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামপঞ্চায়েতই খ্রীঃ পূঃ প্রথম হাজার বৎসর এবং নানা রকমফেরের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রায় দু হাজার বৎসরের আর্থিক বিধি-বন্দোবস্ত। এটাও তাঁদের প্রতীতি যে, এই বিশেষ সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরেই দাসপ্রথার উদ্ভব ও সহাবস্থান ঘটেছিল। স্বভাবতই অনুমান করা যায়, এশিয়াটিক উৎপাদনপদ্ধতি ও দাসপ্রথার মধ্যে ঘটেছিল পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত। এবং সেই ঘাত-প্রতিঘাত নিশ্চয়ই প্রভাবিত করেছিল ভারতীয় সমাজদেহ ও তার শ্রেণীবিন্যাসকে। কি ধরনের ঘাত-প্রতিঘাত ঘটেছিল, তা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, এ সবই সন্ধানের বিষয়। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে এই প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাগুলিই একেবারে অনুপস্থিত।

অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থের এ সব ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য ঐতিহাসিক উপাদানের দৈন্য অনেকাংশে দায়ী। আর সে কথা মনে রাখলে কোনো ভাবেই শ্রীচানানার গবেষণার মূল্যকে লঘু করা সম্ভব নয়। দাসপ্রথার ইতিবৃত্ত রচনায় পথিকৃতের ধন্যবাদ শ্রীদেবরাজ চানানার প্রাপ্য।

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস

সুনীল সেন

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জাতীয় আন্দোলনের যে ইতিহাস* লিখেছেন তা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায় এবং পড়তে ক্লান্তি আসে না। তাঁর ভাষা অনবদ্য, অনিমিত্ত উচ্ছ্বাস বা অনিয়ত মন্তব্য প্রায় নেই; যা আছে তা ঘটনার বিবরণ এবং বিশ্লেষণ। জাতীয় আন্দোলনের সমস্যা (বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা) বারে বারে উত্থাপিত হয়েছে, তার সমাধানের ইঙ্গিত সাধারণত অনুপস্থিত। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ তাঁকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয় না। আধুনিক যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে প্রবীণ লেখকের পরিচিতি নবীন লেখকদের উৎসাহিত করবে।

প্রথম অধ্যায়ে জাতীয় আন্দোলনের পটভূমি সংক্ষেপে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রাক-কংগ্রেসী যুগের সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহ, ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, 'হিন্দু মেলার' প্রতিষ্ঠা, লীটনের দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করে আইন পাশ ইত্যাদি বিষয়গুলি এই অধ্যায়ের প্রধান আকর্ষণ। ভারতীয় মহাবিদ্রোহ (তিনি 'সিপাহী বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়েছেন) প্রসঙ্গে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা আদৌ তর্কাতীত নয়। ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে আধুনিক গবেষণা থেকে যে সব নতুন তথ্য পাওয়া গেছে, তার ব্যবহার লেখক করলেন না কেন, এ প্রশ্ন থেকে যায়। "মোট কথা, মুষ্টিমেয় লোক বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল" (পৃঃ ২৮)—এই ধরনের উক্তি আধুনিক গবেষণা অগ্রাহ্য করেছে। মহাবিদ্রোহের আলোচনা মাত্র দু পৃষ্ঠা স্থান পেয়েছে।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে একটা সংগঠিত রূপ দেবার প্রচেষ্টা শুরু হয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা থেকে—এ কথা সকলের সুবিদিত। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পিছনে হিউম সাহেব এবং তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের কার্য-

*ভারতে জাতীয় আন্দোলন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থম। দশ টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

কলাপ সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়। শ্রী মুখোপাধ্যায় তা করেন নি। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে বাঙালীদের না দেখে চব্বিশ বৎসরের যুবক কবি রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা লিখেছিলেন ("সবাই এসেছে লইয়া নিশান, কই রে বাঙালি কই"), তার উল্লেখ ইঙ্গিতপূর্ণ (৩৮-৩৯)। 'বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন,' 'জাতীয় শিক্ষা', 'স্বদেশী আলোড়ন', 'কন্‌গ্রেসে ভাঙন', 'অসহযোগ আন্দোলন', 'আইন অমান্য আন্দোলন'—এই কয়টি অধ্যায়ে শ্রী মুখোপাধ্যায় ভারতবাসীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং ভারতের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার বিবরণ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

লেখকের মতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু জাতীয়তার ছোঁয়াচ লেগেছিল। তিলকের 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তন, মহারাষ্ট্রে গো-বধ নিবারণী-সভা স্থাপন, শিবাজীর ভগ্ন 'ভবানী মন্দিরের' সংস্কার-কে তিনি "এক দেশদর্শী ধর্মীয়তা" বলে মনে করেন। "অখণ্ড ভাবময় জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী এই মনোভাব" (৭৫)। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে হিন্দু জাতীয়তার স্বর তাঁর কাছে সুস্পষ্ট। "তিনি মুসলমানদের প্রতি সর্বত্র সুবিচার করেন নাই বলিয়া যে অভিযোগ আছে তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে দৈব ও অপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তিনি বিশেষ এক প্রকারের হিন্দুত্ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা যুক্তি-বিরোধী, বিজ্ঞান-বিরোধী রাহস্যিকতা" (৭৯)। বঙ্কিমের "নব্য হিন্দুত্ব" পরবর্তী যুগে বিশেষভাবে পুষ্ট হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দ্বারা (৮০)। "স্বামী বিবেকানন্দ দেশের কিশোর মনের মধ্যে দেশভক্তি ও স্বধর্মে মতি আনিলেন বটে, কিন্তু জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁহার উদাত্ত বাণী দেশবাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল, মর্মে আশ্রয় পাইল না" (৮০)। শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের শিষ্যদের কাজকর্ম সীমিত হল সমাজকল্যাণে ও শিক্ষাপ্রচারে, এবং "সেই শিক্ষায়তনগুলি হইল শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ ধর্ম-সাধনা প্রচারের কেন্দ্র—যাহাকে বিশেষ ভাবে সাম্প্রদায়িক ধর্মই বলিতে হইবে" (৮০)। শ্রদ্ধানন্দ স্বামীর হরিদ্বারে গুরুকুল আশ্রম, বিবেকানন্দের বেলুড়ে মঠ, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপন প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—"ভারতের তিনটি পর্বের প্রতীক ইহারা বৈদিক, ঔপনিষদিক ও পৌরাণিক। সকলেরই উদ্দেশ্য ভারতের আত্মার অনুসন্ধান এবং সেইজন্য এই তিন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তিন মনীষীই অতীত ভারতের দিকে মুখ ফিরাইয়া

"হিন্দুত্ব কি" তাহা আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন" (৮২)। অরবিন্দ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"অরবিন্দের ধ্যাননেত্রে দেশ ও দেবী মাতৃমূর্তিতে প্রকাশিত। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বন্দেমাতরম-এর মন্ত্রদ্রষ্টারূপে অন্তর হইতে শ্রদ্ধা করিতেন। শিবাজীর 'ভবানী দেবী' তাঁহার আরাধ্যা। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ হইতেই ধর্ম ও রাজনীতি তিনি মিশাইয়া লইলেন" (১০৫)।

অপরদিকে সার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মুসলমান সমাজ বিকাশমান জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াল। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ স্থাপিত হল ঢাকা শহরে। "এখন হইতে ভারতের রাজনীতি ত্রিধারায় প্রবাহিত হইল—কন্‌গ্রেসী সর্বভারতীয়তা, তথা-কথিত জাতীয়তাবাদীদের হিন্দুসর্বস্বতা এবং মুসলমানদের ইসলাম-সর্বস্বতা ; ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তা বা জাতীয়তা-মুখর ধর্মীয়তা ভারতকে ধীরে ধীরে বিভক্ত হইবার দিকে লইয়া চলিল" (১২২)।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজির আবির্ভাব এবং ভূমিকা শ্রী মুখোপাধ্যায় সঙ্গতভাবেই এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। এই কথা অবশ্য স্বীকার্য যে গান্ধীজির আবির্ভাব থেকে জাতীয় আন্দোলনে এক নূতন অধ্যায়ের শুরু—যে অধ্যায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে আজও জ্যোতির্ময়। লেখক সুন্দরভাবে এই দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন—"গণসংযোগের দ্বারা গণআন্দোলন সৃষ্টি ছাড়া বিপ্লব সম্ভব হইতে পারে না। রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজির প্রবেশমুহূর্ত হইতে আরাম-কেদারাশায়ীদের রাজনীতি-চর্চার অবসান হইল" (১৪১)। ক্রমে ক্রমে "পুরাতন কন্‌গ্রেসী দলের মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রাজনৈতিক আকাশে আলোকহীন তারকার ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন" (১৫৭)। আন্দোলনের মধ্য থেকেই নেতার জন্ম হয় ; যে নেতা যুগধর্ম বুঝে এগুতে অক্ষম, আন্দোলন তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধীজি যে পথ অনুসরণ করেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত কতটা সাফল্য অর্জন করেছিল ? গান্ধী-আরউইন চুক্তি কি আন্দোলনের কোনো বিজয় সূচিত করে ? তখন ক্রমাগত হিন্দু-মুসললান দাঙ্গা ঘটবার কারণ কি ? এই পট-ভূমিতে নবীন নেতা জহরলালের আবির্ভাব এবং করাচী কংগ্রেসে 'মৌলিক অধিকারসমূহ' সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন (যে প্রস্তাবে সর্বপ্রথম কংগ্রেস

যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ, কৃষিসংস্কার, শ্রমিকদের বিবিধ অধিকার সম্পর্কে বক্তব্য রাখল) প্রভৃতি কি জাতীয় আন্দোলনে নূতন দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে না ? দুঃখের বিষয় আলোচ্য বইতে এই প্রশ্নগুলি আদৌ উত্থাপিত হয় নি। স্বভাবতই শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ তাঁর লেখায় গুরুত্ব পায় নি।

ফেডারেশন শাসন প্রবর্তন এবং "আপোষ নয়—সংগ্রাম" প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হাই-কমাণ্ডের মতবিরোধের তিনি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। হাই-কমাণ্ড "কী ভাবে সুভাষকে অপদস্থ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে কোনো ত্রুটি করিলেন না" (২০৫)। রবীন্দ্রনাথ সুভাষ সম্বন্ধে বিবেচনা করবার জন্য গান্ধীজিকে পত্র দেন ; গান্ধীজি তাঁর মতে অবিচল থাকেন (২০৬)। সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে প্রভাতকুমার ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি লিখছেন "সুভাষচন্দ্র ইতিহাসের ছাত্র এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি-অভিজ্ঞ—তিনি কী করিয়া ভাবিতে পারিলেন যে, যে-জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া গত পাঁচ বৎসর চীনের উপর পাশবিক দৌরাত্ম্য করিতেছে, যে-জাপানী আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া অতর্কিতভাবে পার্ল হারবার ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে,…সেই লুব্ধ পরস্বাপহারক জাপানীরা ব্রিটিশদের হাত হইতে ভারত উদ্ধার করিয়া সুভাষ-চন্দ্রের হাতে উহা সমর্পণ করিয়া দেশত্যাগ করিবে !…সাম্রাজ্যবাদী রাজ-নীতিজ্ঞরা এমন বৈদান্তিক নহেন যে, যে-দেশ রক্ত দিয়া অর্থ দিয়া জয় করিবে —তাহা অপরকে ভোগের জন্য ছাড়িয়া দিয়া আসিবে !" (২৮৩) সুভাষ-চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও তাঁর যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে এমন সুনির্দিষ্ট সমালোচনা পড়ে কোনো কোনো মহল আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণের মতো ক্রোধে ফেটে পড়তে পারেন।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা

চিত্ত ঘোষ

প্রৌঢ়ির প্রান্তে উপনীত অমিয় চক্রবর্তী সম্ভবতঃ বর্তমানে বাংলাদেশের অগ্রজতম আধুনিক কবি। তাঁর কাব্য রচনার বয়স ইতিমধ্যেই উত্তরতিরিশ। এই সময়কালে নিজ বাসভূমে এবং প্রবাস-প্রব্রজ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধিতে বিপুল বৈচিত্র্য সঞ্চিত হয়েছে এবং সেই অসামান্য ফলশ্রুতি তাঁর কবিতায় বহুরূপে বিকীর্ণ। এই নবসম্ভার যে বাংলা কবিতায় নতুন দুর্লভ সংযোজন তা সর্বজনস্বীকৃত। এবং তিনি কবিযশপ্রার্থী মাত্রেরই আরাধ্য না হলেও অবশ্যই সশ্রদ্ধ আলোচ্য।

অমিয় চক্রবর্তীর প্রধান চারিত্র্যগুণ এই যে তিনি যুগপৎ দেশী এবং সর্বদেশী। তাঁর মতো জগৎযাত্রী হওয়া তাঁর সমসাময়িক আর কোনো কবির পক্ষে হয়তো সম্ভব ছিল না। যে কোনো পরিবেশে, যে কোনো পরিমণ্ডলে, অপরিচিতের সঙ্গে সহজেই একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা, এমন সদাপ্রস্তুত মন আর কারো নেই। আত্মীয়তাই তাঁর অন্তরের মূলমন্ত্র। সেজন্য কংগোতীরে, স্তিমিত রৌদ্র, চন্দ্রাঙ্ক সন্ধ্যায়, যুগোস্লাভিয়ার শৈলপথে ফলের বাগানে, গণ্ডোলাদোলা ভিনিসের স্বপ্ন শহরে, সর্বত্র, পৃথিবীর সর্বত্রই তাঁর অবারিত, অনায়াস বিচরণ।

অমিয় চক্রবর্তীর সদ্য সবুজ, প্রস্ফুট-পদ্মচিহ্নিত কবিতার বইয়ে* চোখ রেখে, প্রথম পাঠ সমাপ্ত করে, একথাই মনে হবে, যে, প্রৌঢ় প্রবাসী কবির পক্ষে কবিতার বইয়ের 'ঘরে ফেরার দিন' নামকরণ শুধু উপযোগী নয়, যথার্থও। এই নাম একদিকে যেমন পরবাসীর গৃহমুখী বিধুরতা ব্যক্ত করেছে অন্যদিকে এই তিনটি শব্দের সমবায়ে দীর্ঘ পরিক্রমাক্লান্ত অন্তর্যাত্রীর আলয়ে প্রত্যাবর্তনের আকুলতাও ব্যঞ্জিত। আর এক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সম্ভবত ভবিষ্যতেরও সেতুবন্ধ ঘটার সেই অনন্ত তালিকা, যার কোনো একটি কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা ক্ষমতাবানেরও অনায়ত্ত।

---

*ঘরে ফেরার দিন। অমিয় চক্রবর্তী। নাভানা। সাড়ে তিন টাকা।

কুঁয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কান, বইয়ের দৃষ্টি
গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি
আপনজনকে ভালোবাসা
বাংলার স্মৃতিদীর্ণ বাড়ি ফেরার আশা।

('বড়বাবুর কাছে নিবেদন'—'মাটির দেয়াল')

এই সব ঘোষণা থেকে এ প্রতীতি জন্মে যে অমিয় চক্রবর্তী অনিকেত নন। ঘরবাড়ি তাঁর একটা ছিল এবং এখনো আছে আর তার ভিৎ খুব শক্ত। তাই ঘরছাড়ার দিন ডেকে নিয়ে গেলেও ঘরে ফেরার দিন আসে, আসেই।

পৌঁছতে হবেই বাড়ি
কেনা বেচা শেষ ক'রে
গান কণ্ঠে ভ'রে

('কংগো নদীর ধারে')

'ঘরে ফেরার দিন'-এ সন্নিবিষ্ট বহুবিচিত্র কবিতায় অদৃষ্টপূর্বকে নয়, পরিচিত, প্রত্যাশিতকেই পাওয়া গেল। অমিয় চক্রবর্তীর বিশিষ্ট মেজাজ, নিজস্ব ঘরানা, ঘরোয়া উত্তাপ আর সেই কঠিন সারল্য—সবই। আর কেতাবী ও দেহাতী শব্দ মিলে মাঝে মাঝে তাঁর অভ্যস্ত অভিনব রচনারীতি, যাতে কেতাবীর কেতা যায়, দেহাতীর গ্রাম্যতা থাকে না, এক অন্য তৃতীয় জন্ম নেয়।

জুতো খুলে কী আরাম (যদিও নরম
চামড়া বশ-মানা) বর্মে আঁটা দুটি পদ
এবার পেলরে ছাড়া সারাদিনে ; কম
দামী নয় সন্তুটুপি, তবু সে আপদ

('ক্লান্ত অপিস ফেরতা নরেন')

অথবা

বিদ্যুৎ-করাত চিরে শায়িত বৃক্ষের শরীর
বানাই বুকের তক্তা, মাথায় পল্লব চুল নড়ে
আরণ্যিক মৃত্যু শেষ, শুধুই হিল্লোল হাওয়া লেগে।

('সূত্রধর-সংবাদ')

উপরন্তু এও লক্ষণীয় যে দ্বন্দ্বে দোলায়িত এবং সংশয়ে হতাশায় মাঝে মাঝে

বিদ্ধ হলেও জীবনের ওপর এখনো তিনি আস্থা খোয়ান নি। এবং মানুষের পীড়ন, নিগ্রহ তাঁর সজীব হৃদয়কে যে সহজেই উদ্বেল করে, আলোড়িত করে এবং সেই তাড়নায় যে তাঁর কণ্ঠ থেকে তীব্র ধিক্কারও ধ্বনিত হয় তার প্রমাণ আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় নিবদ্ধ।

ছিন্নবাঁচা বন্দী জনতার
কোথাও খনিতে লুপ্তি, কারা খাটে কলে ;
কালো ত্বক বিধিদত্ত, নির্যাতিত নিগ্রো শোধে তারি
আমৃত্যু ভীষণ দাম অপমানে রাত্রিদিন।
অধম বণিক ঘোরে সাম্রাজ্যপাপের মূর্খ দাপে।

('পর্তুগীজ আঙ্গোলা')

সমগ্র উপনিবেশ আফ্রিকা জুড়ে আজ যখন নৃশংসতম নরমেধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন মৃত্যুকে অমরতা দিয়ে মুক্তিযজ্ঞের অনির্বাণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত, তখন লিওপোল্ডভিল বা নাইরোবিতে অবস্থানকালে লেখা এমন সব কবিতা বিবেকবান মানুষের মথিত আবেগের শুদ্ধ প্রতিধ্বনি হিসেবেই উচ্চারিত হবে। হৃদয়ের এই গুণ আরেকবার প্রমাণিত করল যে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারের অক্লান্ত বাহক। এবং মানুষের কল্যাণ সাধনার সহযাত্রায় তিনি যথেষ্ট নির্দিষ্ট না হলেও এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে তিনি সর্বসময় মানুষের সপক্ষে।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় প্রবলতা নেই, প্রচ্ছন্নতাই তাঁর স্বভাব। তাঁর কবিতায় আহত আত্মার আর্তনাদ নেই। আত্মপীড়নের রক্তাক্ত মুখচ্ছবি নেই। বেদনায়ই তিনি সর্বাধিক ব্যক্ত। সেজন্য মনে হতে পারে যে বিংশ শতাব্দীর সমবয়সী হলেও তিনি তার সহোদর নন। কিন্তু উপাদানের অভাবনীয় বৈশিষ্ট্যে এবং তার ব্যবহারে আধুনিকতা কখনো কখনো প্রায় আতিশয্যের সীমান্তবর্তী।

রীন-মেন-এ ফিরি, চিনি ক্যাম্পিনো
চলেছি অন্য কেন্দ্র
ফেলে এরোড্রাম, বাতিজ্বালা ঘর
জ্যাজ, রাঙা-কার্ড, বিদেশী দুপুর ;

('উড়তি')

তাঁর কবিতার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে সর্বাধিক বিস্ময়ের বিষয় এই যে ভিন্ন

গ্রামে, অন্য শহরে, দেশান্তরে তিনি যত সহজে গিয়েছেন, থেকেছেন, অক্লান্ত অন্তরে সর্বক্ষেত্র থেকে আহরণ করেছেন বিচিত্র বস্তু, তত সহজেই গৃহীত সামগ্রীর তুচ্ছতম অস্তিত্বকে অলঙ্কারের মতো ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়। কিন্তু এই সহজতা প্রবঞ্চক। এই সারল্যের তলবর্তী দৃশ্য জটিল রেখায় আচ্ছন্ন। এবং মাঝে মাঝে তার স্বরূপ শুধু স্বল্পক্ষম বুদ্ধি ও উপলব্ধিরই অগোচর থাকে না পরন্তু এ বিষয়ে পারঙ্গম, পারদর্শী বহুবিদের প্রচেষ্টাকেও হার মানায়। আসল কথা এই যে অমিয় চক্রবর্তীর জগৎ অপরিমেয়। এবং বহু বিষয়ে কিছু কিছু জানাশোনা না থাকলে শুধু কাব্যামোদী পাঠকের পক্ষে তাঁর কবিতার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। তাছাড়া তিনি মিতাচারী, সংকেতাশ্রয়ী, আভাসপ্রিয়। তাঁর কবিতার বিচ্ছিন্নতা বা অসংলগ্নতা আধুনিক জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। এবং নিসর্গে আকর্ষণ থাকলেও নগরেই তাঁর পক্ষপাতিত্ব। ফলে নাগরিক জীবনের চিত্রই তাঁর কাব্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। আর সেই পটাশ্রিত এমন আধুনিক স্তবকে তাঁর বৈশিষ্ট্যে সার্থকভাবে অভিজ্ঞাত :

হাজার হাজার বার
চিনি না ছড়িয়ে চা তৈরি করা
জামার বোতাম না হারানো, ভরা
পকেটে কলম, কলমে রিফিল ; বুকে
বেপরোয়া তবু অতিসাবধানী ট্রাফিক-পেরোনো রীতি
জাগায় না বেশী প্রীতি,
ও পাড়ার ছেলে ডাক নাম জানা তার
প্রতিদিনে এই প্রতিদিন উদ্ধার।

('আরো')

অবশ্য এসবের মাঝে মাঝে এমন কবিতাও তিনি লেখেন যার লঘু সঞ্চার ও লিরিক কান্তি অত্যন্ত উপভোগ্য। তার একাধিক নিদর্শন এই বইয়ের কবিতায় পাওয়া যাবে। এবং সমগ্রভাবে এইসব কবিতা পাঠান্তে স্বতঃই মনে হবে, কি আশ্চর্য কৌশলে বিস্তার গুরুভার থেকে অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কবিতাকে বাঁচালেন।

পরিশেষের কথা এই যে অমিয় চক্রবর্তী শেষ পর্যন্ত চৈতন্যে আশ্রিত।

বাইরের আঘাত যখনই দুঃসহ হয়েছে তখনই তিনি মানস গভীরে "ব্যাকুল মধুর শান্তি" খুঁজেছেন।

সেই ধ্যানসরোবরে
চারিদিক হতে মেঘ ছায়া ফেলে
শীতসূর্য খোলে দিন
আকাশ-আয়না হাওয়া স্বর্ণ ঝরা।

('মানস সরোবর')

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে তাঁর গায়ে যৌবনেই রবীন্দ্রনাথের সৌরতাপ লেগেছিল। এবং প্রধান আধুনিক কবিদের অন্যতম হলেও রবীন্দ্রপ্রভাবের বিরুদ্ধে মুক্তিযুক্তে বিদ্রোহীদের সঙ্গে তিনি কখনো গলা মেলান নি। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম কবিতা রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে সেই মহাকবির উদ্দেশে নিবেদিত। প্রকারে অবশ্য অমিয় চক্রবর্তী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এযুগের চাঁদসদাগর। বাংলা কবিতায় তাঁর তুল্য নিরীক্ষা কম কবিই করেছেন। তবু মনে হয় সূর্যাবর্তই হয়তো তাঁর আদি বাসভূমি। বহুদিন আগে প্রথম প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর ইংরেজী সমালোচনায় আধুনিক কবিদের সম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ যে মন্তব্য সুধীন্দ্রনাথ করেছিলেন তার উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"Whatever claim to progress his successors may choose to prefer on their own behalf, even in the realm of feeling, they have not yet trodden a path which had not been explored previously by Tagore. All that has happened since is the breakup of his illimitable domain into small holdings, that under the best tenants have been more intensively cultivated than befoere."

কবিতা-প্রসঙ্গ

রাম বসু

কবিতা জীবন্ত বলেই তার রহস্য এখনও মানুষের অনায়ত্ত। কোনো একটি বিশেষ সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা কঠিন। সংজ্ঞা সীমিত। কিন্তু জীবন অপরিসীম। তাই সংজ্ঞায় সমগ্রের ধ্যান অসাধ্য। অথচ, মানুষের মনের স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্যই হয়তো, প্রতি যুগেই মানুষ কবিতার রহস্যের তল পেতে চেয়েছে সংজ্ঞার আধারে। এমনকি যে ঋষির মুখ থেকে প্রথম শ্লোক উদ্গাত হল তিনিই অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, এ কি! সেই প্রশ্নের উত্তর আজও পাওয়া যায় নি। আর, পাওয়া যায় না বলেই বোধ হয়, হিন্দু ঋষি কবিতাকে ব্রহ্মস্বাদের তুল্য বলে মনে করেন। সম্প্রতি এলিজাবেথ সিওয়েল কবিতার সংজ্ঞা নিরূপণে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন*।

কিন্তু শ্রীমতী সিওয়েলের কাছে কবিতা ঠিক ব্রহ্ম নয়, সে 'মিথ'। এই শব্দটি সিওয়েলের কাছে বীজমন্ত্র। এই শব্দের অলৌকিক বিভায় কবিতার সমগ্র দিগন্ত উদ্ভাসিত। মানুষের চেতন ও নিশ্চেতন, দেহ ও মন, দৃশ্য ও অদৃশ্য, এক কথায় বোধের সমগ্রতা বাস্তবে ফিরে আসে মিথের আভায়।

অবশ্য কবিতার ব্যাখ্যায় মিথ শব্দটি অনেক আগেই এসেছে। কিন্তু সেখানে সে পুরাণের গণ্ডী পার হতে পারে নি। আক্ষেপ শোনা গেছে আধুনিক জীবন থেকে মিথ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। স্বদেশে ও বিদেশে কবিরা যোগাযোগের সেতু হিসাবে পুরাণ থেকে চরিত্র এনে তাকে প্রতীকের মহত্ত্ব আরোপ করতেও চেয়েছেন। বলা বাহুল্য সুফল হয় নি।

কিন্তু সিওয়েল মিথ শব্দটিকে পুরাণ বা উপকথার স্তর থেকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট। তাঁর কাছে মিথ সেই "activity between mind and language whereby the mind invents the new modes and methods to understand new things." মিথ তাই সর্বব্যাপ্ত বোধ যার

*Elizabeth Sewell: The Orphic Voice—Poetry and Natural History. Yale University Press. $ 7·50.

ওপর ভর করে মানুষের বুদ্ধি শব্দের দিব্য সেতু পার হয়ে অখণ্ড বাস্তবতার সন্ধান পায়। সিওয়েল জোর দিয়েছেন তাই অখণ্ডতার ওপর। মিলের অন্বেষণই তার প্রাণধর্ম। সমস্ত বিশ্ব ও সৃষ্টি চলেছে পরম মিলনের দিকে। মিথের মতন 'ইউনিটি' শব্দটিও সিওয়েলের কাছে গূঢ় অর্থে দীপ্যমান।

এই সমস্ত ভাবনা-প্রতিভার প্রতীক হয়ে আসে 'অরফিউস'। অরফিউস সুরের যাদুতে সম্মোহিত করেছিল দ্যুলোক-ভূলোক। নরকের দ্বার হয়েছিল মুক্ত। প্রাণ দিতে হয়েছিল বন-কন্যার হাতে। কবিতার কাজও এই তিনটে। বস্তুবিশ্ব সম্মোহিত করে কবিতা। সে নিয়ে যায় অসম্ভবের সীমান্তে। এবং তার প্রভার প্রখরতায় পুড়ে যেতে হয় কবিকে। কবিতাই অস্তিত্বের সমগ্রতা এবং সেজন্য অরফিউসই তার প্রতীক। সিওয়েল এখানে বেশ দুঃসাহসিক। অরফিউসই কবিতা। কারণ তার সুরের মন্ত্রে প্রাণ পেল বস্তু ; জড় ও জীবন। কাজ ও ভাবনার মধ্যে যে ফাঁক, দেহ ও মনের মধ্যে যে দূরত্ব, দৃশ্য ও অদৃশ্যের যে ব্যবধান তা ঘুচে যায় অরফিউসে এবং কবিতায়। সমগ্রতা উদ্ভাসিত হয় মিলিত ছন্দের বন্ধনে।

সাম্প্রতিক মানুষ বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতাকে বিধিলিপি বলে ভাবতে অভ্যস্ত। ভগ্ন, ছিন্ন, গৃহহীন, নিরাশ্রিত মানুষ নিরক্ত মনের অন্ধকার সুড়ঙ্গে মাকড়সার জাল বোনাই অবিনাশী কবিতা বলে ভেবে অভিভূত। এই যুগে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা না করে, বরং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষর মিল ঘটাতে চেয়েছেন। শ্রীমতী সিওয়েল এইজন্য বোধ হয় ধন্যবাদের পাত্র।

প্রত্যক্ষ মিথ্যা নয় বলেই বিজ্ঞান অভিষিক্ত হয় সিওয়েলের চিন্তায়। কবিতা ও বিজ্ঞান সহোদর। সৃষ্টিতত্ত্বের বিরাট রহস্যের তারা দর্পণ। তাঁর এই মত প্রচলিত ধারণার ব্যতিক্রম। তিনি বিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ এবং কবিতাকে সংশ্লেষণ হিসাবে দেখতে নারাজ। দুটি কাজ একই। "Science can not be set against poetry because they are structurally similar activities." অঙ্ক শব্দের বিপরীত নয়। কারণ অঙ্ক ও শব্দ একই—"instrument for myth in the mind." আবিষ্কারই এদের কাজ। এরা একটা "mythological situation" আবিষ্কার করে। কেউ শব্দ দিয়ে, কেউ সংখ্যা দিয়ে। কিন্তু লক্ষ্য তাদের এক। জগৎ ও জীবনকে নতুন ভাবনায় দীক্ষিত করা।

বিজ্ঞান আলোচনায় জীববিজ্ঞানে সিওয়েলের বিশেষ আগ্রহ। নিত্য বিবর্তমান জীবন ও তার রহস্য নিয়ে জীববিজ্ঞান মুগ্ধ। কবিতাও তাই। কারণ কবিতা হল "language in a condition of myth-making metaphor."

বিজ্ঞান ও কবিতাকে একই কর্মকাণ্ডের শাখা হিসেবে প্রমাণ করে শ্রীমতী সিওয়েল পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীদের তিনশো বছরের প্রিয় ও পোষা ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। যোগ্যতর ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই সিওয়েলের এই প্রতিপাদ্যকে বিচার করবেন। সাম্প্রতিক জীবনে বিজ্ঞান ও শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ইতিমধ্যে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর কাছে এই সিদ্ধান্ত প্রায় তর্কাতীত সত্য যে মানুষ যতই বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বুদ্ধিকে আয়ত্ত করছে, ততই সে নৈতিক ও কবিতার মহত্ত্ব হারাচ্ছে। কারণ যে যন্ত্রকে সে আবিষ্কার করেছে তার জীবনের কল্যাণের জন্যে, কালক্রমে দেখা যাচ্ছে যে মানুষ সেই যন্ত্রের চাকর হয়ে পড়েছে। সে নিজেও হয়ে গেছে যান্ত্রিক। এই প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে শ্রীমতী সিওয়েল যে উক্তি করেছেন তা নিশ্চয়ই গভীর বিবেচনার যোগ্য।

এই সুদীর্ঘ পুস্তকে শ্রীমতী সিওয়েল একটা দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যাকে এক কথায় বোধ হয় বলা যায় "organic totality." এবং এটি-ই অরফিউসের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকে যাঁরা স্বীকার করেন, অন্তত স্বীকার করেন বলে সিওয়েলের ধারণা, তাঁদের আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কবি আছেন, আছেন বিজ্ঞানী। বেকন, শেক্‌স্পীয়র, এরাসমাস, ডারউইন, ভিকো, গ্যেটে, ভিক্তর হুগো, শেলী, এমারসন, রিলকে প্রভৃতি সম্পর্কে সিওয়েল এই দৃষ্টি থেকে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং বিপদ বোধ হয় এখানে। তাঁর বৈদগ্ধ্যের প্রখরতায় চোখ ধাঁধায়। ফলে বেশ অনেক কিছু অস্পষ্ট থেকে যায়। কিন্তু বিস্ময়ও লাগে এই ভেবে যে বাস্তবকে এমন সমগ্রতায় দেখবার চেষ্টা হচ্ছে যখন মানুষের পরাজয় কারো কারো কাছে প্রায় সুনিশ্চিত। বিজ্ঞানের এক শাখার সঙ্গে অন্য শাখার সম্পর্ক ক্ষীয়মান। শিল্পের এক মাধ্যমের সঙ্গে অন্য মাধ্যমের যোগাযোগ লুপ্ত হবার পথে। সে সময় শ্রীমতী সিওয়েলের ধারণা অভিনন্দন-যোগ্য। অবশ্য সমগ্র চেতনার মধ্যে হোয়াইটহেডের প্রভাব বর্তমান। এবং বোধ হয় এই জন্যই বইটার দাম আরো বেশি।

চিত্রকল্পের সেই বিস্মৃতপ্রায় আন্দোলন

তরুণ সান্যাল

ডি. এইচ. লরেন্স আমাদের দেশে অধুনা সংবাদ-শিরোনামায় জনপ্রিয় নাম। ওল্ড বেইলী তাঁর অসংক্ষেপিত লেডী চ্যাটার্লীর প্রেমিককে মুক্তি দিলেও বোম্বাই আদালত তাকে অন্তরীণ রাখবার আদেশ দিয়েছেন। ডেভিড হারবার্ট লরেন্স প্রচলিত উক্তি-প্রত্যুক্তির সাধারণ্যে সেক্‌সকে উর্দ্ধে স্থানদানকারী ঔপন্যাসিক বলেই সমধিক পরিচিত। অবশ্য সংস্কৃত পরিবেশে লরেন্স তাঁর সাহিত্যজগতে পদক্ষেপের পর থেকেই আলোচ্য ব্যক্তি এবং তাঁর কবিতার বিষয়েও কৌতূহলের শেষ নেই। ডি. এইচ. লরেন্সকে চিত্রকল্পধর্মী (imagist) কবিদের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁকে ইমেজিস্ট আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত জনৈক কবি বলে দেখা বোধ হয় ভুল হবে। আসলে ১৯১৪ সালে লরেন্স-কে এমন একজন প্রতিভাশালী যুবক বলে মনে করা হত যে, ইমেজিস্টরা তাঁর কবিতাকে তাঁদের সংকলনে স্থান দিয়ে মনে করতেন "a writer of genius who would certainly achieve fame and would therefore shed glory on the whole imagist movement।" শ্রীমতী অ্যামি লাওয়েলই লরেন্সকে, তাঁর "The morning breaks like a pomgranate / In a shining crack of red" পঙক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে ছিলেন যে লরেন্স আসলে একজন ইমেজিস্ট কবি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিতা ইমেজিস্ট সংকলনে অন্তর্ভুক্তির দাবি করেন। এই অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ১৯২৯ সালের মে মাসে লরেন্স গ্লেন হিউগসকে* বলেছিলেন যে তাঁকে ইমেজিস্ট বলে চিত্রিত করবার জন্য মূলত দায়ী এজরা পাউণ্ড। বলেছিলেন "In the old London days Pound wasn't so literary as he is now. He was more of a mountenbank then. He practiced more than he

* Glenn Hughes: Imagism and the Imagists : A Study in Modern Poetry. Bowes & Bowes. 42 sh.

preached, for he had no audience. He was always amusing.” এজরা পাউণ্ডের তৎকালীন চরিত্রের এই বিশেষ চিত্রণ অবশ্য বিতর্কসাপেক্ষ, তথাপি ১৯৩০ সালেও যে Imagist Anthology প্রকাশিত হয়, তার কবিতালিকায় রিচার্ড অ্যালডিঙটন, জন করনস, এইচ. ডি. (হিলডা ডুলিটল), জন গোল্ড ফ্লেচার, এফ. এস. ফ্লিন্ট, ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড, জেমস জয়স, উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়ামস্ প্রভৃতির সঙ্গে ডি. এইচ. লরেন্সকেও দেখা যায়। এবং ১৯৩০ সালেই ডি. এইচ. লরেন্সের মৃত্যু হয়। লরেন্স ইমেজিস্ট আন্দোলনে ছিলেন কিনা বিতর্কসাপেক্ষ হলেও, ইমেজিসম্ যে একদা একটি কাব্য-আন্দোলন ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের দেশেও ত্রিশ বা চল্লিশের কোনও কোনও কবি সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে কখনও এই আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এলিঅটের প্রতি মুখ ফেরাতে, অনেকেই অজ্ঞাতে তাঁর পূর্বসূরী—যাঁদের সঙ্গে এলিঅটের পরবর্তীকালে কোনও সম্পর্ক ছিল না—সেই ইমেজিস্টদের, বিশেষভাবে ‘ইমেজিস্ট’ এজরা পাউণ্ডের বহু তৎকালীন মতামতকে মেনে নিয়েছিলেন। তথাপি ইমেজিস্ট আন্দোলন আমাদের দেশে সুপরিচিত আন্দোলন বলে আমরা মেনে নিতে পারি না।

বস্তুত ইমেজিসমের ক্ষেত্রে প্রভাব ও স্ফূর্তির উৎস ছিল দুদিকে। ক্লাসিক্যাল প্রভাব এসেছিল গ্রীক, লাতিন, হিব্রু, চীনা ও জাপানী কাব্য থেকে। আধুনিকতার ছাপ এসেছিল ফরাসী কাব্য-আন্দোলন থেকে। যাঁরা ইমেজিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা যে সবাই একইভাবে প্রেরণা বা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, তা নয়। স্পষ্ট ঘের (hardness of outline), চিত্রকল্পের স্পষ্টতা, স্বল্প ভাষণ, ইঙ্গিতধর্মিতা এবং ছন্দের অধীনতা থেকে মুক্তি—প্রভৃতি সূত্রগুলি তাঁরা ক্লাসিক্যাল গ্রীক, চীনা ও হিব্রু কবিতা থেকে পেয়েছিলেন। ফরাসী প্রভাব তাঁদের নিও-ক্লাসিসিজমের অংশভাগী করে নিঃসংশয় করে তুলেছিল। এবং মতবাদ নিয়ে ফরাসীসুলভ হৈচৈ করবার পদ্ধতিটিও তাঁরা অনুপ্রেরণার মতো লাভ করেছিলেন। অবশ্য ইমেজিস্ট আন্দোলনের পূর্বসূরী ফরাসী প্রতীকতার আন্দোলন—সিম্বলিজম, মনে রাখা দরকার।

প্রতীকতার বিষয়ে পরিচিতি দিতে হলে আমাদের ১৮৬০-এর দশকের দিকে ফিরে তাকাতে হবে, যখন কিছুসংখ্যক উদ্ধত তরুণ রোমানটিসিজমের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পারনাশানস্ (Parnassions) গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। ফরাসী কবিদের স্বভাবটাই একটু হুজুগে। কোনও মতবাদ নিয়ে লড়াই না করা পর্যন্ত তাঁদের স্বস্তি হয় না। ১৮৬৬-১৮৭৮, এই দশ বছরের পারনাশানস্‌গণ রোমান্টিকদের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে Le Parnasse Contemporain নামে তিনটি কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ করেন। যাঁরা এই সঙ্কলনের কবি, তাঁদের মধ্যে মালার্মে, ভের্লেন প্রভৃতি আমাদের দেশে অধুনা কিছুটা শোনা বা কোনও কোনও মহলে পরিচিত নাম। এঁদের লক্ষ্য ছিল আঙ্গিকের অনিবার্যতা (exactness of form) এবং বাস্তবতা (objectivity)। বাস্তববিষয়গুলি তাঁরা বর্ণনামূলকভাবে যেমন প্রকাশ করতেন, তেমনি অন্তরঙ্গ দিকগুলি, বিশেষত আবেগকে তাঁরা অনুপস্থিত রাখতে বিশেষ করে সচেষ্ট হতেন। পারনাশানসদের বাস্তবতার দিকটি অনেকের শেষ পর্যন্ত পছন্দসই হয় নি, ফলে জনৈক প্রথম যুগের পারনাশান-প্রবক্তা শার্ল বোদলেয়ারের দুজন শিষ্য ভের্লেন ও মালার্মে প্রতীকধর্মিতা বা সিম্বলিজমের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। প্রতীকধর্মিতার মূলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আর্তুর র‍্যাঁবোও কম অনুপ্রেরণা ছিলেন না। ১৮৮৫ সালে জাঁ মেরে (Jean More'as) সিম্বলিজম নামটি ব্যবহার করলেন। ১৮৮৫-১৯০০ পর্যন্ত ফরাসী কবিতায় সিম্বলিজম সবচেয়ে শক্তিশালী কাব্যাদর্শ ছিল। ইতিমধ্যে প্রতীকতার আন্দোলনের প্রবক্তাদের রচনা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, ফলে ১৮৯১ সালে জাঁ মেরে ইস্তাহার বের করে ক্লাসিসিস্টদের একত্রিত করলেন। যাঁরা আরও র‍্যাডিক্যাল, তাঁরা কাব্যবক্তব্য ও আঙ্গিকের আরও অভিনবত্বের দিকে এগোলেন। এলেন কিউবিস্টরা (অ্যাপলনিয়, ম্যাক্স জেকব, আঁদ্রে স্যালমঁ), ফ্যানট্যাসটিস্ট-রা এবং ইউন্যানিমিস্টরা, দাদাবাদীরা (এঁদের মধ্যে ছিলেন ককতু, আরাগঁ অনেকেই), তারপর অতিবাস্তববাদীরা—ইত্যাদি ইত্যাদি পালাক্রমে। ব্রেতঁ এবং আরাগঁ অতিবাস্তবতা ও দাদাবাদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছিলেন।

ব্রিটেনে টি. ই. হিউমই (T. E. Hulme) আসলে ইমেজিস্ট আন্দোলনের নাটের গুরু। দর্শনগতভাবে নন্দনতত্ত্বের বিশেষ বিদ্যা, বিভিন্ন ভাষার কাব্যে পারদর্শিতা, বের্গস্‌র সান্নিধ্য এবং আপন ব্যক্তিত্বের অস্থিরতা তাঁকে ইমেজিস্ট আন্দোলনের নেতা করে তুলেছিল। হিউম ১৯০৮-১৯১২ পর্যন্ত ব্রিটেনের লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীদের এক বিশাল অংশের গুরুস্থানীয় ছিলেন। তাঁর

মতামত ও আক্রমণকারী ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে হিউমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জ্যাকব এপস্টাইন বলেছিলেন: "He was capable of kicking a theory as well as a man downstairs when occasion demanded." হিউম প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেন এবং ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিহত হন।

শ্রীযুক্ত এফ. এস. ফ্লিণ্ট এই আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলেন: "I think that what brought the real nucleus of this group together was a dissatisfaction with English poetry as it was then (and still alas !) being written. We proposed at various times to replace it by pure *vers libre*...in all this. Hulme was ring leader. He insisted too on absolutely accurate presentation and no verbioge...(Egoist, May, 1915). এজরা পাউণ্ড ২২শে এপ্রিল, ১৯০৯ সালে দলে যোগ দিলেন। পাউণ্ড তখন "was very full of his troubadours।" ১৯১২ সালে পাউণ্ড টি. ই. হিউমের সম্পূর্ণ কাব্যসঞ্চয়ন প্রকাশ করলেন—পাঁচটি কবিতা ও তেত্রিশ পঙক্তিতে। তার মুখবন্ধে লিখলেন: "As for the future, Les Imagistes, the descendants of the forgotten school of 1909... have that in their keeping।" ব্যস, ইমেজিসমের দল তৈরি হয়ে গেল। ইমেজ শব্দটির সংজ্ঞাগত অর্থও পাউণ্ড উপস্থাপিত করলেন। হিউমের অধিকখ্যাত Autumn কবিতাটি উদ্ধৃত করা যাক:

A touch of cold in the autumn night—
I walked abroad,
And saw the ruddy moon lean over the hedge
Like a red-faced farmer.
I did not stop to speak, but nodded,
And round about were the wistful stars
With white faces like town children.

হিউমের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত বিতর্কের কারণ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তিনি একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করে গেলেন।

১৯০৯ সালে পাউণ্ড হিউমের সঙ্গে যোগ দেন। আমেরিকা থেকে হিল্ডা ডুলিটল ১৯১১ সালে লণ্ডনে এসে পৌছলেন। অ্যালডিংটনকে দলে ডেকে

নেওয়া হল। দুজনেই *vers libre*-তে কবিতা রচনা শুরু করলেন এবং বিবাহবন্ধনে মিলে গেলেন। ইতিমধ্যে ১৯১২ সালে চিকাগো ট্রিবিউনের শ্রীমতী হ্যারিয়েট মনরো চীন দেশে কবিতার সমাদর দেখে ফিরে এসে, উৎসাহিত হয়ে ১০০ জনের কাছ থেকে ৫০ ডলার করে চাঁদা নিয়ে ১৯১২ সালের অক্টোবরে 'Poetry: A magazine of verse' বের করলেন। পাউণ্ড তার বিদেশী প্রতিনিধি হলেন। ১৯১৩ সালে পাউণ্ড ঐ পত্রিকায় ইমেজিস্টদের একটি গোষ্ঠী বলে পরিচিতি দিলেন, তাঁদের নীতিগুলি যথাক্রমে বলা হল:

"1. Direct treatment of the 'thing' whether subjective or objective.

2. To use absolutely no word that does not contribute to the presentation.

3. As regards rhythm, to compose in sequence of musical phrase, not in sequence of metronome."

ফ্লয়েড ডেল চিকাগো ট্রিবিউনে কী কী ইমেজিস্টদের পক্ষে স্মরণীয় তার তালিকা দিলেন। যেমন:

যে সমালোচকেরা উল্লেখযোগ্য কিছু লেখেন নি, তাঁদের কথায় কান না দেওয়া।

যা ইতিমধ্যে ভালো গদ্যে লেখা হয়ে গেছে, নয়নভোলানো পদ্যের ছন্দোবন্ধনে তাকে সাধারণ কবিতায় রচিত করার কোনও প্রয়োজন নেই।

যত বেশি সংখ্যক বড় শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যায়, ততই ভালো, কিন্তু হয় তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করা দরকার, নইলে গোপন করা প্রয়োজন।

বিশেষত আজ যা বিচার করতে ক্লান্তি বোধ হয়, আগামীকাল জনসাধারণ তার জন্য ক্লান্তি বোধ করবে।

কবি তাঁর মনে সুচারু শব্দসীমাসমূহ (cadences) আবিষ্কার করেন, বিদেশী ভাষা থেকে আবিষ্কার আরও চমকপ্রদ কেননা শব্দগুলির অর্থ শব্দের গতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বলে মনে হতে পারে···গ্যেটের গীতিকবিতাগুলিকে আবেগহীন শীতলতার সঙ্গে ব্যবচ্ছেদ করে তাদের অঙ্গীকৃত শব্দমূল্য, সিলেবল্‌গুলি হ্রস্ব দৈর্ঘ্য, শ্বাসাঘাত নিষ্পিষ্ট এবং মুক্ত, স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি-ইত্যাদি বুঝে নিতে হবে।

কবিতা যে সঙ্গীতের উপর নির্ভর করবে এমন নয়, কিন্তু যদি তা কথনও নির্ভর করে, তবে যেন তা বিশেষজ্ঞকেও মোহিত করার ক্ষমতা রাখে।

প্রতি পঙক্তি যেন পঙক্তি-সমাপ্তিতে একেবারে থেমে না যায়, পরবর্তী পঙক্তি যেন পূর্বের পঙক্তির ছন্দের তরঙ্গের উত্থানের সহিত উত্থিত হয়। অবশ্য কবি যদি কোনও বিলম্বিত স্তব্ধতা আনতে চান, সে হল আলাদা কথা।

"The musician can rely on pitch and the volume of the orchestra. You cannot. The term harmony is misapplied to poetry ; it refers to simultaneous sounds of different pitch.... A rime must have in some slight element of surprise if it is to give pleasure"...ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য উদ্ধৃত ব্যবস্থাপত্র এজরা পাউণ্ডেরই মতাদর্শের প্রতিধ্বনি। পাউণ্ড ইমেজ বলতে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা অদ্যাবধিও বহুকথিত সেই সংজ্ঞা "Image, that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time....- It is the presentation of such "complex" instantaneously which gives that sense of sudden liberation ; that sense of freedom from time limits and space limits ; that sense of sudden growth, which we experience in the presence of the greatest work of art." এবং "It is better to present one Image in a life time than to produce voluminous works।" ইয়েটস্ অবশ্য এ ক্ষেত্রে বলবেন : "The only real Imagist was the Creator of the Garden of Eden."

ব্রিটেনে তখন নতুন কবিতা আন্দোলনের বেশ বোলবোলাও। ১৯০৯ সালে ফোর্ড ম্যাডক্স হুবার (এখন ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড) 'English Review' বের করলেন। তিনি পাউণ্ড, ফ্লিণ্ট এবং লরেন্সের রচনা পত্রস্থ করেছিলেন। বছরখানেক পরে পত্রিকাটির হাত বদলের ফলে নতুন কবিতা-আন্দোলন বেশ আঘাত পেল। রক্ষণশীল পত্রিকাগুলির সঙ্গে লড়বার জন্য শেষ পর্যন্ত ১৯১৪ সালে ছোট্ট একটি পত্রিকা ইমেজিস্টরা হাতে পেলেন। ইতিমধ্যে 'Poetry Review', এবং ঐ পত্রিকার উত্তরাধিকারী 'Poetry and Drama'—হারল্ড

মনরোর পোএট্রি বুকশপের সঙ্গে সম্পর্কিত পত্রিকায়—তাঁরা কিছুটা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

তারপর সেই মজার ঘটনাটি ঘটল। ১৯১৩ সালের জুন মাসে 'The New Free Woman : An Individualist Review' পাক্ষিকপত্রটি প্রকাশিত হল। শ্রীমতী হ্যারিয়েট উইভার এবং শ্রীমতী ডোরা মার্শডেন মহিলা আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। এই দুজন বয়স্কা কুমারীর একজনের ছিল দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ অপর জনের বার্কলীয় মেটাফিজিক্সের দিকে প্রবণতা। শ্রীমতী উইভারের কিছু পয়সাকড়িও ছিল। ইমেজিস্টদের পত্রিকাটি চোখে পড়ল। পাউণ্ড ঐ দুজন দর্শনাবিষ্ট মহিলাকে বোঝালেন, বোধ হয় ভজালেন, যে একেবারে আধুনিক মন নিয়ে পত্রিকা বের করা উচিত। ফলে ব্যবস্থাও ঠিক হয়ে গেল। রিচার্ড অ্যালডিঙটনের সহকারী সম্পাদনায় (শ্রীমতী মার্শডেন নামে সম্পাদিকা রইলেন, কৌতূহলী পাঠকেরা তাঁর লেখা সম্পাদকীয় বাদ দিয়েই পত্রিকাটি পড়তেন) 'Egoist' প্রকাশিত হল, অবশ্য 'An Individualist Review' নামটি যুক্ত থাকল।

প্রথম সংখ্যা 'Egoist' প্রকাশিত হল ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারি। ১৯১৫ সালে তা মাসিক পত্রিকা হল, ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে পত্রিকাটি উঠে গেল। ইতিমধ্যে সহকারী সম্পাদনায় রিচার্ড অ্যালডিঙটনের সঙ্গে এইচ. ডি.-র নাম দেখা গেল, ১৯১৭ সালে তাঁদের দুজনের নামের বদলে সহকারী সম্পাদক হিসাবে দেখা গেল নতুন নাম—টি. এস. এলিঅট।

ইতিমধ্যে 'Egoist' প্রকাশের পর দামাল পাউণ্ড একটি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হলেন। অ্যালডিঙটনের দশটি কবিতা, এইচ. ডি.-র সাতটি কবিতা, নিজের ছটি কবিতা এবং আরও অন্যান্যদের কিছু 'ইমেজিস্ট' কবিতা দিয়ে প্রকাশ করলেন 'Des Imagists : An Anthology'. ব্রিটেনে বইটাকে সবাই প্রায় বাঁকা চোখে দেখলেন, শুধু 'Morning Post'-এ একটা ভালো সমালোচনা ছাপা হল। অপমানিত ক্রেতারা হারল্ড মনরোর পোএট্রি বুকশপে বইগুলি ফেরত দিয়ে গেল।

যাই হোক, বইখানি প্রকাশের পর পাউণ্ডের ইমেজিসমের প্রতি ব্যগ্রতা কমে গেল। তিনি নতুন আন্দোলন Vorticism নিয়ে মেতে উঠলেন। তাঁর নতুন ইস্তাহার 'Blast'-এ লিখলেন ফোর্ড ম্যাডক্স হুফার, রেবেকা ওয়েস্ট, এজরা পাউণ্ড, জ্যাকব এপস্টাইন, গদিয়ে-ব্রেজকা এবং টি. এস.

এলিঅট। দল ভাঙাভাঙি সম্পূর্ণ হল। পাউণ্ডের এই আন্দোলনের প্রতি মোহ কাটলেও উপযুক্ত সময়ে ইমেজিস্ট আন্দোলনের রক্ষাকর্ত্রী হলেন শিক্ষিতা অভিজাত অ্যামি লাওয়েল, যিনি "Smoked cigars and worshiped Keats"। বার্কলী হোটেলের আকর্ষণ কেনসিঙটনের তরুণ কবিদের কাছে স্বর্গ বলে মনে হল। (এলাহি ভোজের বদলে যেন) অ্যামি লাওয়েলকে দলনেত্রী বলে মেনে নেওয়া হল। বছরে বছরে ইমেজিস্টদের সঙ্কলন বেরোবে বলে জানান দেওয়া হল। এবং ১৯১৫, ১৯১৬, ১৯১৭-তে সঙ্কলন প্রকাশিতও হল। পাউণ্ডকে নেওয়া হল না। পাউণ্ড ব্যঙ্গ করে এই আন্দোলনের নাম দিলেন অ্যামিইজম। অবশ্য পাউণ্ডের মতে "Imagism was a point on the curve of my development. Some people remained at that point. I moved on।" যে ছজনকে ইমেজিস্ট বলে ঢাক পেটানো হল, তাঁদের তিনজন ব্রিটিশ, (অ্যালডিঙটন, ফ্লিন্ট এবং লরেন্স) বাকি তিনজন মার্কিন (এইচ. ডি., ফ্লেচার এবং লাওয়েল)। নীতি বলে মানা হল:

১। চলতি কথা থেকে শব্দ চয়ন, অবশ্যম্ভাবী বা প্রায় অবশ্যম্ভাবী শব্দ ব্যবহার, অলঙ্কারময় শব্দ বর্জন।

২। কবিতা রচনায় ছন্দগত স্বাধীনতা প্রয়োজন। পুরাতন ছন্দ পুরাতন মেজাজেরই প্রতিধ্বনি করে। নতুন শব্দের ধ্বনির সীমানা নতুন চিন্তার বাহন। সেজন্যই *vers libre* ব্যবহার প্রয়োজন।

৩। কবির বিষয় নির্বাচনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। সেজন্য আধুনিক জীবনের এরোপ্লেন, মোটরগাড়ি নিয়ে বাজে কবিতা লেখার চেয়ে অতীতের বিষয়বস্তু নিয়ে ভালো কবিতা লেখা ঢের বেশী মূল্যবান।

৪। চিত্রকল্পের বিষয়ে একেবারে নিবিড় রূপদান প্রয়োজন। Cosmic ধোঁয়াটে কবি হওয়ার মানে কবিতার সমস্যা এড়িয়ে গিয়ে ফানুস রচনা।

৫। কবিতা হবে দৃঢ় পীনদ্ধ, স্পষ্ট এবং অবধারিত।

৬। ঘনত্বই কবিতার নিশ্চিত সারাৎসার।

১৯১৭ সালে যদিও এই সিরিজের শেষ সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, কিন্তু ১৯৩০ সালে পুনরায় নতুন একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হল। 'Imagist Anthology 1930'-এ কবিতা লিখলেন এবার অ্যালডিঙটন, কোর্নোস, এইচ. ডি., ফ্লেচার,

ফ্লিন্ট, ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড, জয়েস, লরেন্স এবং উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়মস। ভূমিকা লিখলেন ফোর্ড ম্যাডক্স এবং গ্লেন হিউগস।

১৯৩০ সালের 'Imagist Anthology'-তে অন্যতম ভূমিকা লেখক গ্লেন হিউগসের 'Imagism and the Imagist' সত্যই উপাদেয় গ্রন্থ। ১৯৬০ সালে দীর্ঘদিন পরে, বইটির পুনঃপ্রকাশ ঘটল। বৈঠকী ঢঙে লেখা হলেও আন্দোলনের ইতিহাস, সূত্রপাত, তার প্রতিক্রিয়া, গদ্যপদ্যের বিতর্ক ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ইতিহাস সম্মত চমৎকার আলোচনা করেছেন। আজ ইমেজিস্ট আন্দোলনের অনেক নামই নানা কারণে নানা দিকে তর্কসাপেক্ষ। তবুও ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কয়েকজন কবির ভূমিকা তিনি অত্যন্ত সুপরিচিতভাবে চিত্রিত করেছেন। লরেন্স, পাউণ্ডের ব্যক্তিগত দিকগুলিও যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি প্রত্যেকের বিষয়ে বিচারও প্রায় বিতর্কহীন করে তুলতে চেয়েছেন, যেমন কাউকে বিদ্রোহী, কাউকে যথার্থ ইমেজিস্ট বলেছেন। লরেন্স, তাঁর মতে "The passionate Psychologist" এবং এজরা পাউণ্ড "Poet, Pedagogue" ও "Propagandist", অতঃপর etc. দিতে ভোলেন নি।

ইমেজিস্ট আন্দোলনের ভস্মাবশেষ নিয়ে টেমসের জল বহু বছর ধরে সমুদ্রে মিশেছে। তবু আধুনিক নতুন কবিতার প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে তাঁদের নেতৃত্ব, বহু ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যবস্থাপত্রের সতর্কবিচার অদ্যাবধিও নতুন কবিদের শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে আছে। ১৯৩১ সালের পর বইটির ১৯৬০ সালে নতুন সংস্করণ প্রকাশ আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। বহু বিতর্কসাপেক্ষ বিষয়ের ইতিহাস চোখের সম্মুখে রক্তমাংস পেয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। বইটির সুধীমহলে পরিচিতি, বিশেষভাবে তরুণ কবিদের নিকটে, প্রার্থনীয়।

এ যুগের কবিতা

কৃষ্ণ ধর

কার্ল মার্কস ইয়োরোপের প্রধান ভাষাগুলি আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি প্রায়ই একটি কথা বলতেন—একটি বিদেশী ভাষা জীবন-যুদ্ধের একটি হাতিয়ার—বিদেশী ভাষার অনভিজ্ঞতা থেকে মনস্বী মার্কসের এই উক্তির যাথার্থ্য বেশি উপলব্ধি করছি। বিশেষতঃ কবিতার রসাস্বাদনে ভাষান্তরণ এক দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক। কবির অনুভূতি নিজস্ব ভাষাকে অবলম্বন করেই কাব্যের শরীরে রূপ নেয়। ভাষার নিজস্বতার যে চিত্রময়তা, তার দেশজ ঐতিহ্যে জড়িত বাক ও অর্থ, অনুবাদে কখনই যথার্থভাবে সংক্রামিত হয় না।

এ যুগের কাব্য আন্দোলনে দেশ ও কালের সীমাবদ্ধতা ক্রমশ ঘুচে যাচ্ছে। ইয়োরোপের প্রধান ভাষাগুলিতে, ইংরেজী, ফরাসী, জর্মন, স্পেনিশ, রুশ ও ইতালীয়, গত এক শতাব্দী ধরে কবিতার যে ব্যাপ্তি, নানাবিধ দুরূহ পরীক্ষার কাঁটাতারের বেষ্টনী অতিক্রম করে অপেক্ষমান জনসাধারণের কাছে এসে পৌঁছেচে, আমরা বাংলাদেশে, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারে লালিত হয়েও, সেই বৃহৎ ব্যাপ্তির দিগন্ত থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। আলোচ্য গ্রন্থটিতে* ইয়োরোপের ও আমেরিকার প্রধান ছয়টি ভাষার উল্লেখযোগ্য কবিতা আন্দোলনের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কালের সীমা বিগত অর্ধ শতাব্দী। বাংলাদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রেও বিগত পঞ্চাশ বছর নানাদিক দিয়ে অতীব উল্লেখ্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার পরিপূর্তি এবং নব্য কাব্য আন্দোলনের সময় সীমাকেও এই অর্ধ শতাব্দীর গণ্ডিতে চিহ্নিত করলে ক্ষতি নেই। ইয়োরোপীয় কবিকূলের দুঃসহ বিষাদ, যন্ত্রণা ও গভীর অর্থে আনন্দের ক্ষীণ অংশভাগী হয়তো আমরাও হয়েছি। তবে আমাদের কাব্যের উৎস প্রতীচ্যভূমি ততটা নয়, যতটা রবীন্দ্রনাথের চিত্তভূমি। আধুনিক কালের

*J. M. Cohen : Poetry of This Age (1908-1958). Arrow Books Ltd., London. 5 sh.

একগলা কলরবের গভীরে বসবাস করেও একথা বলতে লজ্জা নেই, বাংলা কবিতা এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে যথার্থরূপে অতিক্রম করতে পারেনি। আমরা যখন রবিপ্রদক্ষিণে অনুভূতির পরিমাপে ব্যস্ত, ইয়োরোপ খণ্ডে সে সময়ে কাব্যের চিরন্তন দুর্গে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করছেন নতুন স্বপ্নাবিষ্ট কবিকূল। এক অন্ধ নিয়তির আহ্বানে আজ থেকে এক শতাব্দী আগে শার্ল বোদলেয়র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফরাসী কবিতায় তিনি আনলেন এক নতুন শিহরণ, যা ভূতের গল্প আর সাহিত্যিক কচকচানিতে অভ্যস্ত প্যারিসে এনে দিল অনাস্বাদিত চমক। এই প্রতীকী কাব্য আধুনিক কবিতা আন্দোলনের একটি প্রধান ও জরুরী উপকরণ। বোদলেয়রের কবিতায় আধুনিক ইয়োরোপীয় কবিতায় এই নতুন, তির্যক বক্তব্যের সবল আত্মপ্রকাশ। কিন্তু লক্ষ্যে তিনি পৌঁছুতে পারেননি। পৌঁছুবার তাগিদও ছিল না তাঁর। কারণ তিনি জানতেন, "প্রকৃত যাত্রী তারাই, যারা শুধু চলবার জন্যই শুরু করে যাত্রা; হাল্কা বেলুনের মতো তাদের হৃদয়, নিয়তি থেকে সরে আসে না তারা। কিন্তু সব সময়েই তারা বলে, চল বেরিয়ে পড়ি, কোথায় যাব তা জানিনে, জানবার দরকার নেই।" (লে ভয়েজ)

আধুনিক ইয়োরোপীয় কবিরা কিন্তু বোদলেয়রের মতো এতটা বেপরোয়া নিরুদ্দেশযাত্রী নন। ইয়েটস এবং রিলকে উভয়েই অন্ততঃ জানতেন, খণ্ডিত হলেও, সত্যকে তাঁরা আবিষ্কার করতে পেরেছেন। রিলকের কবিতায় এই মহৎ আবিষ্কারের প্রক্রিয়া কাব্যসৃষ্টির মধ্য দিয়েই যেন স্বতঃউৎসারিত। ইয়েটস্‌ও শেষ পর্যন্ত অস্পষ্টতা থেকে বেরিয়ে এসে এই সত্য জেনেছিলেন যে জড় জগতের অন্তহীন অগ্রগমন সময়ের অনুসঙ্গী হলেও তার পশ্চাতে রয়েছে এক অগ্নিশিখা যার উত্তাপে ছাই হয়ে যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। এলিয়ট কিন্তু অন্য সুরে কথা বললেন। বোদলেয়রের মতোই তাঁর অন্বিষ্ট কিছুই নেই, যাত্রা করাটাই সবচেয়ে জরুরী। 'ফোর কোয়ার্টেট'-এ তিনি মোহমুক্ত হয়েই বলেছেন; "তোমরা যারা স্টেশন থেকে যাত্রা করলে আর যারা টার্মিনাসে পৌঁছুলে তারা এক লোক নও।"

কবিতার স্বপ্নজগতে বিচরণশীল এই কবিদের বিষণ্ণ প্রতীতি, হতাশা এবং সকরুণ অসহায়তার ফলে ইয়োরোপের মনে এসেছিল এক চরম নৈরাশ্য। অথচ কবিদের কাছেই অনেক অনুচ্চারিত, অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তরের আকাঙ্ক্ষায় বারংবার জনসাধারণের উপস্থিতি। দুর্ভাগ্যের বিষয় শার্ল বোদলেয়র কিংবা

স্তেফান মালার্মে সে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন। ইয়েটস্, রিলকে এবং তাঁর জর্মন সহযোগী স্টেফান জর্জ অনেক সময় সেই প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ করে সাফল্যের আলোকে কবিতাকে উজ্জ্বল করেছিলেন।

গ্যটের পর স্টেফান জর্জই (১৮৬৮-১৯৩৩) জর্মনদের মধ্যে সবচেয়ে 'ইয়োরোপীয়' কবি। জর্জ আদর্শবাদী। কবি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। নবজীবনের প্রবক্তা হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তিনি সগৌরবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা হয়ে উঠল কয়েকটি শরতের গীতিগুচ্ছ, ভার্লেনের প্রভাব যাতে সহজদৃষ্ট।

রাইনার মারিয়া রিলকে (১৮৭৫-১৯২৬) জাতিতে জর্মন হলেও ফরাসী প্রতীকী কবিদের দ্বারাই প্রভাবিত। গ্যটে ও হোল্ডারলিনের ছায়া মাঝে মাঝে রিলকের কবিতায় পড়েছে। কিন্তু তাঁর মৌল প্রেরণা ফরাসীদেশের শক্তিমান প্রতীকী কবিকূল। জর্মন ভাষার পুরুষালী দার্ঢ্যে তিনি ফরাসী নমনীয়তা আনবার সার্থক চেষ্টা করেছেন। মিস্টিক আমেজ তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় লক্ষণীয়। কিন্তু রাশিয়ার বিশাল গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করবার পর রিলকের কবিতার গুণগত পরিবর্তন আসে অস্বাভাবিক প্রত্যয়ে। মৃত্যুর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ রিলকের কবিতায় ছড়িয়ে থাকলেও জীবনের অনিবার্য অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর কাম্য। ঈশ্বরের কাছে রিলকের এই প্রত্যক্ষ প্রশ্ন অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই উচ্চারিত হয়েছে : "তুমি কী করবে, ঈশ্বর, যদি আমার মৃত্যু হয়। আমি তোমার পানপাত্র (যদি আমি ভেঙে যাই), আমিই তোমার পানীয় (যদি আমি নষ্ট হয়ে যাই ?) আমিই তোমার আভরণ, তোমার পণ্য, আমাকে হারালে, তোমার উদ্দেশ্যই হবে ব্যর্থ।" স্টেফান জর্জ জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে অবশেষে কলাকৈবল্যের কারুকার্যের অন্তরালে নিয়েছিলেন আশ্রয়। রিলকে জীবনকে উপলব্ধি করেছিলেন সৃষ্টির প্রক্রিয়ারূপে। কবি হিসেবে তাঁর সমস্যা ছিল অন্তরজগৎ ও বাইরের জগতের ঐক্য সাধন, নতুনতর প্রতীকের সাহায্যে এই সত্যকে দৃপ্তবাক্যে প্রকাশ করা। জর্মন কাব্যের ঐতিহ্যে রিলকের পরিশ্রমী প্রচেষ্টার তুলনা বিরল। ভাষা ব্যবহারে তাঁর কুশলতা পরবর্তী জর্মন কবিদের কাছে এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। ফরাসী দেশে যেমন ছিলেন লাফর্গ। অবশ্য লাফর্গের কাছেও রিলকের ঋণ কম নয়।

তরুণ বয়সে ভালেরি (১৮৭৫-১৯৪৫) পাঠ নিয়েছিলেন মালার্মের কাছে। তাঁর প্রথম কবিতাগুচ্ছে মালার্মের প্রভাব তাই সহজেই আবিষ্কৃত। কিন্তু

গভীরতর প্রয়াসে তিনি পরে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করেন। মালার্মের রোমান্টিক আশ্রয়ী কবিতার ঐতিহ্য থেকে মুক্ত হয়ে ভালেরি ধ্রুপদী ঐতিহ্যে তীব্র, তীক্ষ্ণ ছন্দে ও ভাষায় লিখলেন কবিতা। ভালেরি অনেক বেশি চিত্ররূপময়। বিমূর্ত শব্দসৃষ্টিতেও তিনি সমান কুশলী। ভালেরির জীবনের অম্বিষ্ট কাব্য সৃষ্টি। তাঁর নার্সিসাস শান্ত গোধূলির আলোতে দীঘির কালো জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধ। কিন্তু তার মন ব্যথিত হয়ে ওঠে যখন সে জানে এই জলে আরও মানুষ তাদের মুখের প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করেছে। ভালেরি জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন ; তার সূক্ষ্মতম সঙ্গীতের সুর আহরণ করেছিলেন সুরহীন অন্য মানুষের শ্রবণকে তৃপ্ত করার জন্য। জর্জ, রিলকে ও ভালেরি—এই ত্রয়ীর প্রচেষ্টয়ে ইয়োরোপে প্রতীকী কাব্য আন্দোলনের পুনর্জন্ম ; ফরাসী কাব্যের আঙিনা পেরিয়ে এই কাব্যধারা ইয়োরোপের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। তন্মধ্যে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাবেন রাইনার মারিয়া রিলকে।

এই শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ দিকে ইয়োরোপে কাব্য আন্দোলনে নতুন পরীক্ষার অনুগামীরা প্রকাশ করলেন 'ফিউচারিস্ট ম্যানিফেস্টো' (১৯০৯)। কাব্যে শক্থেরাপীই এঁদের লক্ষ্য। উচ্ছৃঙ্খল, অভাবিত ও অশ্লিষ্ট শব্দ প্রয়োগে কাব্যকে পুরাতনের শৃংখল বন্ধন থেকে মুক্ত করবার জন্যই এঁদের উচ্চকিত প্রয়াস অপ্রত্যাশিত সমর্থন পেল ফরাসী কবি আপোল্যনেয়রের। আপোল্যনেয়র প্রতীকীদের প্রভাব খর্ব করবার জন্য ফিউচারিস্টদের এই দুর্বার আন্দোলনে সহযোগিতা করলেন। শব্দের স্বাধীনতাই ছিল এই আন্দোলনকারী কবিদের মুখ্য ঘোষণা। এই আন্দোলনের অনুগামী ইতালীয় কবি গিয়েস্পে উনগারেত্তি (জঃ ১৮৮৮) এ যুগের কবিতা আন্দোলনে স্মরণীয় পুরুষ। শব্দ ব্যবহারের পরিমিতি, অযৌক্তিক শব্দ বর্জন এই নতুন কবিগোষ্ঠির কাব্যে এক শুদ্ধতা এনেছিল। উনগারেত্তির কবিতায় এই পরিমিতি অসাধারণ সাফল্যে দীপ্ত। মুসোলিনীর দাপটে তিনি স্বেচ্ছায় স্বদেশ থেকে নির্বাসন নিয়ে ব্রেজিলে চলে যান। ১৯৪২ সালে আবার ফিরে আসেন স্বদেশে। ফাসিস্তদের সর্বনাশা নীতিতে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি ও মানব সভ্যতার সমূহ ধ্বংসের চিত্র ভবিষ্যৎ বক্তার মতো তিনি তুলে ধরেন তাঁর কবিতায়।

রাশিয়ায় ফিউচারিস্ট আন্দোলনের ইস্তাহার ঘোষিত হয় ১৯১২ সালে। তার উদ্ধত নামকরণ : 'গণ রুচির গালে একটি চাপড়'। তাঁরা সদম্ভে

ঘোষণা করলেন : “আধুনিকতার নৌকো থেকে ঠেলে ফেলে দাও পুশকিন, দস্তয়ভস্কি আর তলস্তয়কে...”। রুশ ফিউচারিস্টদের প্রধান প্রবক্তা ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি (১৮৯৪-১৯৩০) হলেন বিপ্লবের প্রধান কবি। বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে নবজীবনের দৃপ্ত অভিযান মায়াকভস্কির কবিতায় লাল ফৌজের দুঃসাহসিক অগ্রযাত্রার মতোই দুর্বার স্রোতে ধাবমান। মায়াকভস্কির কবিতার সঙ্গে বাংলাদেশের পাঠকদের পরিচয় নিবিড়। মায়াকভস্কির কণ্ঠে বিপ্লবীর স্পর্ধা গগনস্পর্শী। শব্দ ও ছন্দ ব্যবহারেও তিনি নতুন রুশ কবিতার স্বীকৃত পথিকৃৎ। কবিতায়, যদি শব্দটি সপ্রযুক্ত হয়, ‘ভায়োলেন্স’ মায়াকভস্কির চেয়ে সার্থক আন্তরিকতায় অন্য কোনো কবি এই শতাব্দীতে প্রয়োগ করতে পারেন নি। অথচ জীবনের সূক্ষ্মতম অনুভূতিও মায়াকভস্কির কবিতায় হীরকের দীপ্তি নিয়ে বারবার প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।

বরিস পাস্তেরনাক (১৮৯০-১৯৬০) স্নায়ুযুদ্ধের দৌলতে বিশ্ব পরিচিত। পাস্তেরনাক সমকালীন কোনো কাব্য আন্দোলনের সহযাত্রী ছিলেন না। তবে কবিতার ভাষা পুনর্গঠনের জন্য ফিউচারিস্টদের দাবির প্রতি ছিল তাঁর নীরব সমর্থন। চিত্রকল্প সৃষ্টিতে পাস্তেরনাকের পরিশ্রমী প্রয়াস অনেক সময় পুরো কবিতাটিকেই চিত্রকল্পে উন্নীত করেছে। পাস্তেরনাক মূলতঃ প্রকৃতির কবি। চিত্রকরের মতো সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সুরকারের মতো ঐক্যসাধনের দক্ষতায় তিনি এক একটি কবিতাকে নিটোল সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন। গভীর দার্শনিকতায়, জীবনের প্রতি বিশ্বাসে তিনি অবিচল। প্রকৃতির অদৃশ্য শব্দ, অন্তঃপুরচারী চিন্তা এবং অলক্ষ্য বিকাশের গোপনচারী ধারাকে তিনি মানব মনের বিবর্তনের সঙ্গে অনেক সময় আশ্চর্য আন্তরিকতায় গ্রথিত করেছেন। এলিয়টের মতো তিনি অনির্দেশ্যবাদী নন। ‘মাই সিস্টার লাইফ’ কবিতায় তিনি রাত্রির ট্রেনে দূরযাত্রার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে পথচলার আনন্দই, লক্ষ্যে পৌছানোর চেয়ে বেশী। কিন্তু যে মন নিয়ে তিনি যাত্রা করেছিলেন, ঠিক সেই মন নিয়েই পৌছুতে চান গন্তব্যস্থলে। ডাঃ ঝিভাগোর কবিতাগুচ্ছে পাস্তেরনাক স্তিমিত অথচ স্থিতধী ; জীবন সম্পর্কে দৃষ্টি আরও প্রগাঢ়।

স্পেনে ত্রিশের দশকের শ্রেষ্ঠ কবি ফ্রেডেরিগো গ্রাৎসিয়া লোরকা (১৮৯৯-১৯৩৬) এবং রাফায়েল আলবের্তি (জঃ ১৯০৯)। ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কোর দস্যু-

বাহিনীর হাতে গৃহযুদ্ধের প্রথম দিকেই লোরকা নিহত হন। মৃত্যুর এই বিয়োগান্ত মর্মবেদনায় লোরকা ইয়োরোপে ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধের প্রতীকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। লোরকা আন্দালুসিয়ার লৌকিক আদিম আবেগ কাব্যে রূপায়িত করেছেন। তদোপরি লোরকা ছিলেন সুদক্ষ নাট্যকার। অগ্রজ কবি হুয়ান র‍্যামন হিমেনেথের অনুগামী রূপেই লোরকা স্পেনের কাব্য আন্দোলনে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁর কবিতার ব্যাপক এবং প্রচণ্ড চিত্রকল্প রচনার শক্তি হিমেনেথের (১৮৮১-১৯৫৮) শান্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতাকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর লৌকিক জীবনের উত্তাপকে স্পর্শ করেছে। স্পেনীশ লোকজীবনের সার্থক রূপকার গ্রাৎসিয়া লোরকা। ১৯৩১ সনে স্পেনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর লোরকা সরকার কর্তৃক নাট্যপ্রযোজক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে-সময়েই তিনি গ্রামাঞ্চলে অভিনয়োপযোগী বিখ্যাত নাটকগুলি রচনা করেন। লোরকার নাটক, তাঁর কবিতার মতোই একটি জাতির সার্বিক প্রতিরূপ। লোরকা এবং আলবের্তি উভয়েই স্পেনের জাগ্রত গণ-আত্মার প্রতিভূ। ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটরদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ইয়োরোপে যে প্রতিরোধের কাব্যআন্দোলন গণতন্ত্রকামী মানুষের মনে ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, এই দুই কবি, নিশ্চিতরূপে, তার পুরোগামী ভেরীবাদক।

এই প্রতিরোধের কাব্য ফ্রান্সে নতুনতর শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করল পল এলুয়ারের (১৮৯৫-১৯৫২) কবিতায়। কমিউনিজমের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্বতন সুরিয়লিস্ট কবি পল এলুয়ার নাৎসী কবলিত প্যারিসের প্রতিরোধ-আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন তাঁর আশ্চর্য কবিতার চিত্রকল্পে, আবেদনে এবং সুগভীর ব্যঞ্জনায়। ১৯৪৩ সালের অন্ধকার দিনগুলিতে এলুয়ার স্বপ্ন দেখছেন নতুন উষার :

“ভাইগণ, এই সকালটা তোমাদের, পৃথিবীর সমতলে এই সকালটাই তোমাদের শেষ সকাল, এখানে তোমরা শয্যা পেতেছ : ভাইগণ, এই দুঃখের সাগরের ওপারে এই সকালটা আমাদের।”

ক্রুশবিদ্ধ ইয়োরোপের মানবাত্মার জয়গান মুখরিত হয়েছে এলুয়ারের কবিতায়। প্রতিরোধের অপূর্ব শক্তিশালী কবিতাতেও এলুয়ারের চিত্রকল্প আশ্চর্য প্রাণবন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কবিতাগুলিতে এলুয়ার অত্যন্ত সার্থকতায় ব্যক্তিগত চিত্রকল্পের সঙ্গে জনবোধ্য চিত্রকল্পের আশ্চর্য

সংযুক্তি ঘটিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এলুয়ারই শ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ কবির সম্মান পাবার যোগ্য। অবশ্য এই প্রসঙ্গে এলুয়ারেরই সহযাত্রী লুই আরাগঁর কবিতা সশ্রদ্ধায় স্মর্তব্য। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের লেখক তাঁর নামোল্লেখ করেন নি।

ইতালীর আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি সালভাতোর কোসিমোদো (জঃ ১৯০১) এলুয়ারের মতোই প্রতিরোধের কবিতায় ফাসিস্ত মুসোলিনীর আমলে জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। প্রতীকে ও চিত্রকল্পে এলুয়ারের মতোই কোসিমোদো আধুনিক। অথচ চিরকালের আবেদনে তাঁর কবিতা উজ্জ্বল। যুদ্ধের সময়ে রচিত একটি কবিতায় তিনি বলছেন:

"হে সন্তানগণ, ভুলে যাও, মৃত্তিকা থেকে রক্তাক্ত মেঘ উঠছে আকাশে, ভুলে যাও তোমাদের পিতাদের: ভস্মস্তূপের আড়ালে ডুবে গেছে তাদের সমাধি।"

কোসিমোদো জীবনের প্রতিশ্রুতির কবি। নিরলংকার তাঁর ভাষা। তিনি যুদ্ধের বীভৎসার মধ্যেও স্বপ্ন দেখেছেন নির্ভয় এক পৃথিবীর।

লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবি পাবলো নেরুদা (জঃ ১৯০৪) ইয়োরোপী ট্র্যাডিসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। নেরুদার রাজনৈতিক সচেতনতা, স্বচ্ছ দৃষ্টি এব শোষিত জনগণের স্বপক্ষে তাঁর সংশয়হীন বক্তব্য স্বভাবতই গ্রন্থকারের পছন্দ হয়নি। তথাপি তিনি এই শক্তিমান কবিকে উপেক্ষার শীতলতায় বর্জ করতেও পারেন নি। নেরুদার রাজনৈতিক কবিতাতেও মানব ইতিহাসে ব্যাপক পরিধি কাব্যকলায় সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের উপকরণে প্রসারিত। স্পেনে গৃহযুদ্ধে লোরকার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সময়ে তিনি মাদ্রিদে ছিলেন। লোরকা মৃত্যু নেরুদার মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি সে সময় থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কবিতে পরিণত হন এবং মার্কস্বাদে অবিচল বিশ্বা হয়ে ওঠেন। নেরুদার কাব্যে লাতিন আমেরিকার সভ্যতা এবং লোকায় সংস্কৃতি বলিষ্ঠভাবে রূপায়িত।

মায়াকভস্কির মতোই তিনি মানবতাবাদী, উচ্চকণ্ঠ এবং ভাষা ব্যবহা অপূর্ব শক্তিমত্তার অধিকারী।

বর্তমান গ্রন্থে ব্রিটিশ কবিদের সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা রয়েছে। টি. এ এলিয়ট, সিট্ওয়েল রবার্ট গ্রেভস, ডিলান টমাস, অডেন, ম্যাকনিস ও ডে, লুই আলোচ্যদের অন্তর্ভুক্ত। মার্কিন কবিদের মধ্যে এজরা পাউণ্ড ও রবার্ট ফ্র

এ যুগের কবিতা আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এঁদের কাব্যকলা, জীবনদর্শন এবং রচনা সৌকর্যের সঙ্গে আধুনিক বাংলার উৎসাহী পাঠকদের পরিচয় রয়েছে। বিশেষ করে এলিয়টের প্রভাব আধুনিক বাংলা কাব্যে অগ্রজদের মধ্যে প্রায়শই অনুভূত।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে: 'আমরা এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?' আমার মনে হয় এ প্রশ্নের ইঙ্গিত শুধুমাত্র ইয়োরোপ ও আমেরিকার কবিতা পাঠকদের কাছেই নয়, সকল দেশের উৎসাহী ও অনুরাগী পাঠকদেরই একটি বড় জিজ্ঞাসা। এযুগের কবিতার অন্বিষ্ট কী? হয়তো রবীন্দ্রনাথের মতোই আমাদের এই জিজ্ঞাসা বারবার সমুদ্রতটে উচ্চারিত হবে: "বলো কোন পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী?"

ব্রিটেনে যুদ্ধের সময়ে নব্য-রোমান্টিক আন্দোলন আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ভের্নন ওয়াটকিনস্, জর্জ বার্কার ও ডব্লু. এস. গ্রাহাম প্রমুখ তরুণ কবিরা এই নতুন পরীক্ষার পুরোগামী।

ফ্রান্স ও আমেরিকাতেও কবিতার রূপ ও রীতির গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। ফরাসী কবিতায় আবার ফিরে এসেছে সুররিয়ালিজমের প্রভাব। নাৎসী যুগের অন্ধকার উত্তরণ করে জর্মন কবিতায় শোনা যাচ্ছে এলিয়ট, এলুয়ার, মায়াকভস্কি ও নেরুদার কবিতার প্রতিধ্বনি। রিলকে ও ট্রাকলের কবিতার প্রতি এযুগের জর্মনরা নতুন করে মনোনিবেশ করেছেন।

একমাত্র স্পেনে, ফ্রাঙ্কোর ডিক্টেটরি শাসন, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ এবং নিপীড়নের ফলে, প্রতিরোধের কবিতার সুর এখনও প্রতিধ্বনিত। কিন্তু নেরুদা কিংবা মায়াকভস্কির মতো প্রত্যক্ষ বিপ্লবের আহ্বান সে-কবিতায় নেই। মানবমর্যাদার সপক্ষে এ যুগের স্পেনের তরুণ কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোসে হিয়েরো (জঃ ১৯২২)।

যুদ্ধোত্তর যুগে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়কদের মানবতাবিরোধী মারণাস্ত্র অভিযান, স্নায়ুযুদ্ধ এবং সর্বনাশা ধ্বংসের অশুভ পদধ্বনিতে স্বভাবতই ইয়োরোপ ও আমেরিকার কবিদের মন আচ্ছন্ন। এই সংকটের যুগে বাস করে কবিদের মনে প্রতিরোধের স্পৃহা জাগলেও, তার কাব্যগত রূপ নেবে মানবিক প্রেম, অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যের নিরাভরণ প্রকাশে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের সংকটের ছায়া দূর হতে না হতেই নতুনতর সংকট পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করেছে। সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিস্ময়কর অগ্রগতি, শক্তিবৃদ্ধি এবং মানবিক

মূল্যবোধের অভ্রান্ত স্বীকৃতিই এই হতাশাম্লান যুগে কবি ও সাহিত্যিক একমাত্র আশার আলোক। বর্তমান গ্রন্থকার সেদিকে কোনো ইঙ্গি দেন নি। তবে তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হ যায় যে বর্তমান সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আধুনিক কবিদের কমিউনিকেশ ভাষাকে করতে হবে সরল ও সহজবোধ্য। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে বৃহ পরিপ্রেক্ষিতে সহস্র হৃদয়ের সংবাদী করে তোলাই আজকের যুগের কবি লক্ষ্য। কবিকে আজ আর ভবিষ্যদ্বক্তার ভূমিকা গ্রহণের দাবি না করে জনসমষ্টির হৃদয়ের কথা, প্রেম, জীবন ও মহত্তর অনুভূতির কথাই গভী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কাব্যের প্রকরণে সহজ, সরল, নিরলংকার ভাষায় বলতে হ সেখানেই কবিতার মুক্তি এবং কাব্যের ভবিষ্যৎ।

মধুসূদনের কবিতা

দেবদত্ত নিয়োগী

মধুসূদনের কাব্যে গীতিপ্রবণতা আছে, এ কথা নতুন কিছু নয়। বালক রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা থেকে আজ পর্যন্ত রসিকরা এ বিষয়ে একমত। কিন্তু মধুসূদনের গীতিধর্মকেই মুখ্য আলোচ্য করে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এই প্রথম রচিত হল। আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ লিরিক—এমন কবিতা মধুসূদনের আছে। কিন্তু তার উপর নির্ভর করেই সমালোচকরা মধুসূদনকে গীতিধর্মী বলেন নি, অন্যান্য রচনার মধ্যে এই লক্ষণ যথেষ্ট আছে বলেই তাঁরা এই অভিমত পোষণ করে এসেছেন। সেই দিকটাই আলোচনা করেছেন অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য। বইটিতে* চারটি ভাগ আছে। প্রথমভাগে গীতিকবিতা এবং মধুসূদনের সঙ্গে সমসাময়িক সাহিত্যধর্মের যোগ আলোচিত হয়েছে। 'তিলোত্তমা সম্ভব' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর গীতিধর্মও লেখক দেখিয়েছেন। পরের ভাগগুলিতে যথাক্রমে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এবং 'চতুর্দশ-পদী কবিতাবলী'র আলোচনা। সুতরাং এই বইতে মধুসূদনের প্রতিভার এই দিকটার যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

মধুসূদনের জীবনীর পাঠকরা জানেন, দোষই বলি আর গুণই বলি, অসংযম তাঁর স্বভাবের একটা লক্ষণ। এমন আত্মহারা কবি আমাদের দেশে কমই জন্মেছেন। তাঁর রচনার মধ্যেও এই অসংযমের সাক্ষাৎ যথেষ্ট পাওয়া যায়। অসংযমের জন্যই মেঘনাদবধের মূল কাহিনীতে ভারসাম্য বিচলিত এবং এরই জন্য বীরাঙ্গনার একাধিক চরিত্র প্রতিষ্ঠিত আদর্শ থেকে স্খলিত। অসংযম শিল্পকলার দিক থেকে দোষের হতে পারে কিন্তু কাব্যে ভাবের দিক থেকে সব সময় দোষের বলে গণ্য করা যায় না। বৈষ্ণব পদাবলীর মূল ভাববস্তুর মধ্যে আবেগের বন্যা আছে কিন্তু সেই আবেগই সৃষ্টি করেছে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যকে। আধুনিকতম কালের বুদ্ধিবাদী কবিদের বাদ দিলে

* গীতিকবি শ্রীমধুসূদন। ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। সৃষ্টি প্রকাশনী। পাঁচ টাকা।

এতকাল অনুভূতিবাদী কবিদের কাব্যে আবেগ সার্থক গীতিকাব্যকে সম্ভ করে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে রেনাশাঁস-পরবর্তী সাহিত্যে অসংযমকে প্রধান লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আজ আর কেউ সন্দেহ করে না। এ কথাও সত্য যে কবিচিত্তের এ অসংযত আবেগ নাটক মহাকাব্য এমনকি উপন্যাস প্রভৃতি কাহিনীমূলক রূপ-রীতির বাইরে বিশুদ্ধ ভাবপূর্ণ লিরিক কবিতায় পরিণত হয়েছে। আগে কাহিনীমূলক সাহিত্যের মধ্যে স্থানে স্থানে এই আবেগ আত্মপ্রকাশ করেছে পরে কাহিনীকে একেবারে বাদ দিয়ে নিছক আত্মভাবকে নিয়ে কাব্য রচনা হয়েছে। এইজন্য সাহিত্যতত্ত্বে একটি বহুপ্রচলিত মত, ক্লাসিকের মধ্যে রোম্যান্টিক চেতনা থাকা খুবই স্বাভাবিক। এ দুটি বিরোধী নয়।

কিন্তু বিচার্য এই যে গীতিধর্ম ও গীতিকবিতা কি এক বস্তু? মহাকাব্য প্রভৃতি বস্তুনিষ্ঠ কাহিনীর মধ্যে আমরা যা পাই, তাকে কি গীতিধর্ম বলব, না গীতিকবিতা বলব? অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বিস্তৃত বিশ্লেষণের প যখন বলেন "মধুসূদনের প্রতিভা খণ্ড গীতিকবিতা রচনারই প্রতিভা মহাকাব্যের সুদীর্ঘ কাহিনী রচনার প্রতিভা নহে"—তখনও সংশয় দূর হ না। চতুর্দশপদী কবিতাবলী মধুসূদনের সাহিত্যজীবনের শেষ ফসল সত্য কিন্তু ধারাবাহিক ক্রমে শেষ বলেই কি প্রমাণিত হয় যে এখানেই কবি প্রতিভা স্বাভাবিক স্ফূর্তি পেয়েছে? কবিতা হিসাবে যে এই সনেটগুলি উৎকৃষ্ট নয়, একথা শুধু মোহিতলালই বলেন নি, অধ্যাপক ভট্টাচার্যও স্বীকার করতে বাকি রাখেন নি। এই কবিতাগুলিতে ব্যক্তি-মধুসূদনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়—এই পর্যন্ত বলা যায়।

এমন একদিন ছিল যখন সাহিত্যের বহিরঙ্গ আকৃতিটাই সমালোচনায় বিশেষভাবে বিবেচনা করা হত। মানববুদ্ধি ও মানব অভিজ্ঞতার বহু বিস্তারে আজ সাহিত্যের শ্রেণীলক্ষণকে মুখ্য চিন্তনীয় করে রাখা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতার মধ্যে এবং অনুভূতির জগতে যে জটিলতা ও মিশ্রণ চলেছে প্রকাশের রীতিতে তা দেখা দেয়ই। উপন্যাসের মধ্যে কাব্য, নাটকের মধ্যে গীতিধর্ম, প্রবন্ধের মধ্যে গল্প, গল্পের মধ্যে প্রবন্ধ—এ সব লক্ষণ এখন আর দুর্লভ নয়। কোনো রচনা কোনো বিশেষ শ্রেণীর মানদণ্ডে সার্থক কিনা এ প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাড়া আর বিশেষ ওঠে না।

অনুভূতির এই মিশ্রণ ঘটতে আরম্ভ করেছে রেনাশাঁসের পর থেকেই বিশেষ করে। ব্যক্তিত্বের বন্ধন মোচনের ফলে মনের ভাগাভাগি ক্রমে লুপ্ত হতে থাকে; লেখকের ব্যক্তিভাবটাই প্রাধান্য পেতে থাকে। এই ভাবেই সৃষ্টি হল রোম্যান্টিক সাহিত্যের।

এই জন্যেই মধুসূদন ক্লাসিকাল মহাকাব্যকে সামনে রাখলেও শাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য লিখতে পারলেন না। শাস্ত্রের সূত্রকে বারবার লঙ্ঘন করে গেল আত্মপ্রক্ষেপণের অবচেতন বাসনা। মধুসূদনকে তাঁর যুগ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এর ব্যাখ্যা পাওয়া শক্ত হয়। বলা প্রয়োজন, এ কথাটা সাহিত্য সূত্রের নির্বিচার অনুসরণে বলছি না। মধুসূদনের জীবনই আমাদের এদিকে সবলে আকৃষ্ট করে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য মধুসূদনকে যুগ প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত করে সেভাবে আলোচনা করেন নি। তাতে দুটি প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। প্রথমত ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রাধিকার ও ভাববস্তুর পূর্ব সূত্র তিনি পেয়েছেন ভারতচন্দ্রের কাব্যে। দ্বিতীয়ত বীরাঙ্গনা কাব্যের একাধিক নায়িকাকে প্রাচীন কাহিনীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে দেখে তিনি পীড়িত বোধ করেছেন। মধুসূদন ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে নায়িকার আদর্শ পেয়েছেন কথাটা নতুন শোনালেও সম্পূর্ণ সম্ভব। এ দিক দিয়ে অনুসন্ধান আমাদের বাকি ছিল। ভারতচন্দ্রের ভাষার উপকরণ দিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন, এ কথাটিও সম্পূর্ণ সত্য না হলেও একেবারে ভিত্তিহীন নয়। মধুসূদনের কাল পর্যন্ত ভারতচন্দ্র ছিলেন অনুকরণযোগ্য শ্রেষ্ঠ কবি। সেই হিসাবে ভারতচন্দ্রের প্রভাব স্বাভাবিক ও সঙ্গত। লেখক যে মিল দেখিয়েছেন তা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু এটাও ঠিক যে মাঝখানে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ আমাদের মনের জগতে আদর্শের পরিবর্তন না ঘটালে ভারতচন্দ্রের পরেই ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনার সৃষ্টি হত না। ব্রজাঙ্গনার বিরহকে লেখক বিরহ বলে স্বীকার করতে চান নি। তাঁর মতে বৈষ্ণব পদাবলীতেই আছে সত্যকার বিরহ। আমাদের মনে হয় ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে পদাবলীর বিরহ মিলনেরই নামান্তর।

ব্রজাঙ্গনার বিরহই বরং বেশি বাস্তব, বেশি দুঃখকর, না পাওয়ার বেদনা এখানেই তীব্র। কারণ এখানে কোনো আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা নেই। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের আধুনিকতা এখানেই। ব্রজাঙ্গনার রাধা পদাবলীর শ্রীরাধা নন।

এই পার্থক্যের ইঙ্গিত অধ্যাপক ভট্টাচার্য দিয়েছেন তবে কারণ নির্দে করেছেন ভারতচন্দ্রের প্রভাবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিবেচ্য, ভারতচন্দ্রের কাব্যে মধ্যযুগের দৃষ্টিভঙ্গি অবসান ঘটছিল বলে অনেকেই মনে করেছেন। তাঁর কাব্যেই মানুষকে দেবতার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেতে দেখা গেল। এই মানবধর্ম ব হিউম্যানিজম্ কি আধুনিক সংস্কৃতির মানবধর্মের অনুরূপ? ভারতচন্দ্রে নায়িকার প্রভাব যদি ব্রজাঙ্গনায় পড়েও থাকে তবু এই প্রশ্নের মীমাং প্রার্থনীয় থেকে যায়।

বীরাঙ্গনা কাব্যকে গীতিকাব্যের শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ওভিডের জীবনকথার বিস্তৃত অবতারণা করে লেখক দেখিয়েছেন মধুসূদ কতখানি তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। এই আলোচনা অভিনব এবং চিন্তা উজ্জীবক। ওভিডের পত্রে মানব হৃদয়ের কতকগুলি শাশ্বত বৃত্তিকে উপজী করা হলেও কবি তাঁর সমকালীন সামাজিক পরিবেশ দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবি হয়েই কাব্য লিখেছিলেন। বীরাঙ্গনা রচিত হয়েছিল ওভিডের অনুকর তাই এতে ভারতীয় সংস্কারের যথেষ্ট অভাব আছে। রুক্মিনী পত্রটি ছা বীরাঙ্গনার অন্য পত্রগুলি অভারতীয় আদর্শে পরিকল্পিত। অধ্যাপক ভট্টাচা এই কথাগুলি মনে রেখে বীরাঙ্গনার চরিত্র আলোচনা করেছেন। আমাদে মনে হয় এই জন্য তাঁর বিচার কিছু বাধাগ্রস্তও হয়েছে।

ওভিডের অন্ধ অনুসরণটাই কি বড় কথা? ভারতীয় নীতিবোধকে মধুসূদন সম্মান করেন নি। কিন্তু তা ছাড়াও জীবনের ধর্মে আরও কি বাকি থাকে এবং সেটাকে স্থূল বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কারণ সেট জীবনের সত্য। পুত্রশোকাতুরা জননী জনা যে "উচ্চ ক্ষাত্রনীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াও মহাভারতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নারীচরিত্রগুলিকে নিতান্ত হীন ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন" এতে এবং তাঁহার "লালসাময়তা"য় সমালোচ ওভিডের প্রবল প্রভাব অনুমান করেছেন। নারীহৃদয়কে কবি যে নূতন দৃষ্টিতে দেখেছেন এর মূলে শুধুই ওভিডের প্রাণহীন প্রভাব ছিল না, ছি জীবনের মুক্ত উপলব্ধি। যে কারণে মেঘনাদবধের প্রমীলা বধূ হয়ে অশ্বারোহিনী সেই একই কারণে জনা জননী ও রানী হয়েও ক্রোধে আত্মহা —অর্থাৎ সেই প্রতিহত নারীহৃদয়ের আবেগ। এই প্রতিহত রূ দেখিয়েছিলেন মহাকবি মহাভারতের দ্রৌপদীর মধ্যে। অধ্যাপক ভট্টাচা

যথার্থ অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সেই সমান্তরাল দৃষ্টান্তটি এনেছেন এই প্রসঙ্গে। কিন্তু আমাদের আক্ষেপ থেকে গেল, এত বড় সমর্থন পেয়েও সমালোচক মধুসূদনের সৃষ্টিকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। মানব চরিত্রের বাস্তব রূপটিকে কিছুতেই তিনি গীতির ঊর্ধ্বে ভাবতে পারেন নি। বীরাঙ্গনার আলোচনায় এই দ্বিধার পরিচয় স্পষ্ট। আধুনিক যুগের জীবনবোধ যে নূতনভাবে রূপ নিতে চলেছে, এই কথা বিশ্বাস করলে সত্যই আর দ্বিধা থাকে না। এই জীবনচেতনা থেকেই কবির ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপলব্ধি বল সঞ্চয় করে এবং তার থেকেই গীতিকবিতার জন্ম হয়। মধুসূদনের কাব্য বিচার করতে গিয়ে সুপণ্ডিত গ্রন্থকার অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণকুশলতার পরিচয় দিয়েও দ্বিমনস্কতার হাত থেকে মুক্তি পান নি।

একশো বছরের বাংলা কবিতা

বার্ণিক রায়

যুগের দিশারী কবি-মনে পরিবর্তনের আনন্দ কাব্যসৃষ্টির মূলীভূত প্রেরণা, পরিবর্তনের স্রোতে ব্যক্তিত্বের আলোড়ন জ্যোতির্ময় সত্তার প্রকাশকে বিচিত্র শোভন ও হৃদ্য করে তোলে। কিন্তু প্রত্যেক যুগেই চারিত্র্যপ্রধান কবি-আন্দোলনে একটি যুগবৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মনে হয় এই চারিত্র্যই বুঝি কবিতা, কিন্তু যে ব্যক্তিত্বে nexus of essence-এর অভাব, যা আমাদের সত্তাকে আলোড়িত করতে পারে না, সুপ্ত বাসনা সংস্কারকে পৃথিবীর বিচিত্রতর মানব ও প্রকৃতিলোকের মায়ায় দীপ্তিমান ও দ্যুতিমান করে তুলতে পারে না, আমাদের আত্মচৈতন্যের বিস্তৃতির মধ্যে গভীরতর ব্যঞ্জনার সুরভি আনতে পারে না, তাকে কবিতা বলা সাজে না। কবিতায় শিক্ষানীতি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যক্ষ স্থান নেই, রাজনীতির রণধ্বনিও এখানে মুখ্য নয়, পাঠকের ব্যক্তিত্বে আনন্দ ইম্প্রেশন সক্রিয় করে তোলাই কবি-ব্যক্তিত্বের প্রধান কাজ, একটা এফেক্ট সৃষ্টি করাই তাঁর প্রধান কর্তব্য। ফিলিং ও ইমোশন গভীরতর ব্যঞ্জনা সংকেতে উদ্দীপিত হলেই সূক্ষ্মরহস্যের লীলারস হৃদয়কে বিস্ফার করে তোলে, এটা নির্ভর করে কবির আত্মিক ব্যক্তিত্বের আলোড়ন, অনুভব সমন্বয় ও সামঞ্জস্যে। কবিতার সার্থক সংজ্ঞা সম্ভব না হলেও এই জাদুস্পর্শী আনন্দবেদনার পার্থিব সত্যতা একান্ত অনিবার্য। এটি নির্ভর করে কবির সততা, আত্মপ্রকাশ ক্ষমতা, বিচিত্র অভিজ্ঞতার ওপর।

১৮৬১ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত কবিতার মধ্যে যুগের পরিবর্তনে অনেক ঘোলাজল নোনাজল ও মিষ্টিজলের স্রোত এসেছে*। কিন্তু কবিতা-বিচারের মানদণ্ড আঙ্গিকে কিছু পৃথক ঘটালেও রসের দিক থেকে তেমন কোনো মারাত্মক পরিবর্তন আনে নি। এবং এও সত্য যে তা আনতে পারে না। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'শতাব্দী শতক' কবিতার

* প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত **শতাব্দী শতক** এবং জীবেন্দ্র সিংহরায় ও শক্তিব্রত ঘোষ সম্পাদিত **বাংলা সনেট** অবলম্বনে।

সংকলন গ্রন্থে বাংলাদেশের এই বিচিত্র কাব্যস্রোতের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সংকলনে প্রত্যেক কবিরই পূর্ণাঙ্গ রূপ নেই, কিন্তু কালের দিক থেকে একটা পরিবর্তন অনায়াসেই পাঠক লক্ষ্য করতে পারেন, হয়তো এমন অনেক কবিতা আছে, যাকে তাঁরা প্রতিনিধি স্থানীয় মনে করেছেন, তা নয়। কিন্তু তবু, এঁদের সংকলনে এই একশো বছরের পরিবর্ত্যমান জীবনধারার সঙ্গে কবিতার পরিবর্তন দৃষ্টিগোচরে আসে। বলা বাহুল্য, সংকলনে কবির ও কাব্যের বস্তুভূমিক বাস্তবতার চেয়ে সংকলনকর্তার রুচি ও মর্জিই বিশেষ প্রতিফলিত হয়। সুতরাং তাঁদের রুচি ও মর্জির অনুকরণে এই সংকলনের মধ্যে একশো বছরের বাংলা কবিতায় যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তাই আলোচিতব্য।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যাঁরা কবিতা রচনা করেছেন, তাঁদের কাব্যে তেমন লিরিক আবেদন, বা একান্তই আত্মচিত্তকে প্রসারিত করে দেবার বিপুল প্রেরণা নেই, বরং বস্তুভূমিকতা, নারীর দেহে সাম্রাজ্য বিস্তার কল্পনা, ঘটনা ও কাহিনীর প্রত্যক্ষ ধারণাগত অনুভব, প্রায়শ নীতিমূলক চেতনা, নতুবা নবীন সেনের সেন্টিমেণ্টাল উচ্ছ্বাস, দাম্পত্যজীবনকে কেন্দ্র করে গৃহিণীর মধ্যেই রোমান্টিক বিদেশিনীর প্রত্যক্ষ ছায়াপাত—এগুলিই স্থান পেয়েছে। এহেন মধুসূদনের মধ্যেও লিরিক কল্পনাকে গ্রাস করেছিল চেতন-অবচেতনের বস্তুভূমিক এপিককল্পনা। ফলে সনেটের রূপকল্পেও ব্যক্তির মনের ও হৃদয়ের প্রেম ভালোবাসার অকুণ্ঠ অনাবৃত ও জ্যোতির্ময় প্রকাশ সম্ভব হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের অধিকাংশই প্রেম নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন, বিষয়বৈচিত্র্য কয়েকজনের মধ্যে দেখা গেলেও শৃঙ্গারই এখানকার সংবাদী সুর। এবং এই শৃঙ্গারে দেহকে অস্বীকার করবার কোনো সলজ্জ আত্মঅধ্যাস ছিল না, বলদেব পালিত ঘোষণা করে বলেছেন, "'তব দৃগঞ্জনযোগে এ প্রেম সঞ্চার / তবে কেন না পাই ও দেহ রাজ্যভার"। গোবিন্দ দাস চীৎকার করে বলেছেন, 'আকণ্ঠ লইব চুষি যত ইচ্ছা তত খুশি চুষে নিব মেদমজ্জা চুষে নিব হাড়"। উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ কবিতায় একটা ফিলিং আছে, কিন্তু ইমোশন নেই। ফলে বাইরের বস্তুজগতের সংযোগে কবিমনের ঈষৎ অভিঘাতই ধারণার প্রকাশে রূপ পেয়েছে। অনেকের রচনায় আঙ্গিক ও বিষয়, ভাষা ও বক্তব্য মেলে নি, রোমান্টিক লিরিক উচ্ছ্বাসকে ক্লাসিকের স্থিরতা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর

সামাজিক নৈতিকতা সে-যুগের কবিতায় সুন্দরভাবে প্রকট। হেমচন্দ্রের বহুখ্যাত কবিতায় সদ্যোবিধবা রমণী পূর্বপ্রিয়তমকে বলছে, "ছিলাম তোমার আমি, তুমিই আমার স্বামী ফিরে জন্মে প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে"। প্রিয়তমের কাছ থেকে বদনচুম্বন লাভ করেও হিন্দু সংস্কার-আচ্ছন্ন নারীর এই উক্তি সে-যুগের নীতিকেই প্রকাশ করছে। আধুনিক লিরিক কবির কাছে বদনচুম্বনের পর যে মনোভাবে কাব্যের বাক্‌প্রতিমা গড়ে উঠত, তাতে বিশ্ব স্থষ্টির অপূর্ব রাগিণী ব্যঞ্জনাগর্ভে স্পন্দিত হত।

রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষার ভিত্তিপথ রচনা করেছিলেন যথাক্রমে বিহারীলাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ। পয়ার ত্রিপদীর বাঁধা সড়ক পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্যে লিরিক উচ্ছ্বাসকে সুদূর দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রনীলিমা এনে দিলেন। পূর্বযুগের বস্তুভূমিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র বিহারীলালই তাঁর কাব্যের অগ্রদূত। বিশ্বস্থষ্টির লীলায় স্বতঃউৎসারিত বিস্ময়ই বিশ্বের রহস্য পাপড়ি খুলে ধরেছে, বিশ্বধ্বংসের মধ্যে চির শান্ত বিশ্বাসের অরুণের টিকা ললাটে নিয়ে তিনি জন্মেছেন, এই কারণেই সপ্তর্ষি হিমাদ্রি বনস্পতি উন্মত্ত তরঙ্গভঙ্গ সকলের সঙ্গেই তাঁর আত্মার যোগ স্থাপিত হয়েছে, ক্ষণকালের মধ্যে মহাকালের অদৃশ্য চক্রধ্বনি তিনি শুনতে পান।

রবীন্দ্র-মধুচক্রকে কেন্দ্র করে যে মধুকর বৃত্তিপরায়ণ পঞ্চকবি অক্ষম অনুকরণে ভাব ও ভাষার গন্থিক প্রয়াস করেছেন, তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্র বাগচী ও করুণানিধানই ঈষৎ কাব্যপ্রতিভার বলে স্মরণীয়। যদিও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দের শিশুমন ভোলানো জাদু অনেকের মধ্যে প্রভাবপাত ঘটিয়েছে, তার ফলে করুণানিধানের কবিতার আঙ্গিক ভাবের সঙ্গে যৌপপদ্য লাভ করে নি। কিন্তু অদৃশ্য অসীম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভাবনীয় অনির্বচনীয় জগদাতীত রহস্যমায়ামধুর জীবনদৃশ্যের রূপ চিত্রায়নে রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার ব্যক্তিত্বের যে সক্রিয়তা অনিবার্যভাবে লক্ষণীয়, তা এঁদের মধ্যে অনেকাংশেই পঙ্গুব্যর্থতায় পর্যবসিত।

আধুনিক যুগের যুগসন্ধিক্ষণে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ও মোহিতলালের নাম স্মরণীয়। যতীন্দ্রনাথের বুদ্ধিবাদী আস্তিক মনে দার্শনিকতা, যুগ-সচেতনতা, ব্যঙ্গবিদ্রূপপরায়ণতা যতখানি, সেই পরিমাণে কবিচিত্তের স্বগতবাণী ও অনুভব অনুচ্চারিত। নজরুলের গানে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ পেলেও কবিতায় যুগ ও জীবনের সামগ্রিক গভীরতা অনহুভূত।

মোহিতলালই এঁদের মধ্যে কাব্যগুণে সমৃদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর গোবিন্দ দাসের দেহবাদ, ভির্লোঁর নারীবাস্তবতা, ভ্যালেরির রক্তদেহ ও মনের দ্বন্দ্ব, তদুপরি রোমান্টিক অলৌকিক আকৃতি সব মিলে তাঁর কবিচিত্তকে দীপ্তি দিয়েছিল, এই দীপ্তিই বস্তুভূমিক সংকেতে রূপ পেয়েছে। যতীন্দ্রনাথের 'কর্মকার' কবিতাটি একটি রূপক, কিন্তু মোহিতলালের 'বসন্তবিদায়' কবিতায় চিত্রগুলি সংকেতে ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠেছে। কবির ব্যক্তিগত বসন্তবিদায় প্রকৃতির বসন্তে সুন্দর সংকেতিত হয়েছে। যৌবনবসন্তে ভাবনা অলীক, সেটিই সংকেতে প্রকাশ করলেন :

লয়ে ফাগুনের চূত মঞ্জরী
অলকে পরিনু—অলি-গুঞ্জনে অলীক ভাবনাতুর।

মর্ত্যপ্রেমিক কবির জীবন-উপলব্ধি সংকেতে ইঙ্গিতে প্রসঙ্গে চমৎকার ব্যক্ত হয়েছে :

আমি মরণেরে, তার নীলতনু ঘেরি জীবনের পীতবাস
পরায়ে, সাধাব হৃদয়-রাধারে কত না করেছি আশ।

বলতে গেলে জীবনানন্দ দাশ থেকেই আধুনিক কবিতার যুগলক্ষণ প্রকট হয়েছে। যুগের হতাশা জ্বালা ব্যর্থতা যন্ত্রণা যুগসচেতনতা অনিকেত মনোভাব, চেতন অবচেতন মনের বিকৃত লীলা, নৈরাশ্য নৈরাজ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা স্থান পেয়েছে। এযুগের প্রায় কবিই রাত্রির স্বপ্নের ভিতরে একটি কুষ্ঠকলঙ্কিত নারীর আশ্চর্য গান শুনতে পেয়েছেন, সাবিত্রীপ্রসন্নের মতো "কোরকে কোরকে তার কীট জাগে অতি ভয়ংকর" মনে করেছেন, বিমল ঘোষের "রক্তগোলাপ বুকের রক্তমোছা রুমাল" হয়ে উঠেছে। এই যুগসচেতন হতাশ্বাসের পেছনেই রয়েছে এক অব্যক্ত অন্ধ বেদনার অসীম আকুতি। এবং যুগসচেতন কবির ব্যক্তিত্ব জীবনানন্দের মতো শুধু এই বলে কবিচিত্তকে সান্ত্বনা দেয় নি, "দীনতা অস্তিমগুণ, নক্ষত্রের আলো"। তাঁরা সাম্যবাদীর মতো এই হতাশ্বাস জ্বালা ব্যর্থতার মধ্যেই নবীন জীবনের আবির্ভাবকে সম্ভাবিত করতে চেয়েছেন, সমর সেনের মতো কবিও নববর্ষের প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন :

অনেক ঘাটের জল খেয়ে বুঝি
অনেক লোক যেখানে
সেখানে সত্তার নতুন সূর্য ওঠে
কালের ঘোলাটে জলে জোয়ার লাগায়

সম্ভব হয় অনেকের খেয়া পারাপার
গভীর জলে একের শবদেহ ডোবে।

মঙ্গলাচরণের 'জননীযন্ত্রণা' ও সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'টালা ট্যাংকে' কবিতা দুটিই বিষয় ভাববস্তুর দিক থেকে, আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় বিশ্বাসে চমৎকার সংকেত-আবেগে প্রকাশিত। সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের শান্ত স্থির চিত্রের শেষে জীবনের প্রত্যয় আবেগ চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে; "টলোটল ঝলোমল ধীর জল শীতল উজ্জ্বল"। মঙ্গলাচরণের সমগ্র কবিতায় হৃদয়াবেগ সঞ্জীবিত, প্রতীকে বিস্তারিত, ভাষার সুরে সংকেতিত, ঐতিহ্যভাষায় স্পন্দিত।

এই সঙ্গেই আছে প্রেমের নিরুদ্বেগ শান্তি, 'হে পদ্মার' মতো কবিতায় স্থির নৈর্ব্যক্তিক ভাবচিত্র। অচিন্ত্য সেনের মতো "বুকের কাছে সহসা পাথার নাচ" শুনতে পেয়েছেন অনেকে, অমিয় চক্রবর্তীর মতো "এই মাটি চষেই ফসল বানাতে" চেয়েছেন, অনেকে অজিত দত্তের মতোই এই ধরণীকে গভীর বন ভেবেছেন—যেখানে নৃত্যমত্ত সহস্র পরীর ও নিশাচরীর পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেবের মতোই নির্জন যৌবনের আবির্ভাবে আত্মহারা হয়েছেন। তবে ক্লান্তসুরে ঘুমিয়ে পড়বার চেতনা প্রায় অনেকেরই। প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন অজ্ঞাত রহস্যদেশে নবীন সবুজ দেশের মায়ায় যাত্রা করেছেন, তেমনি প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ক্লান্ত নাবিকের মতো গতযামিনীর কালি নিয়ে গ্রামের শুরুতে পাহাড়তলীর সরু একফালি জমি খুঁজেছেন। এই ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রানুসারী কবিতাও কবিতার জন্যেই চোখে পড়ে। জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অনুসরণ ও তাঁদের মিলিয়ে মিশিয়ে অক্ষম অত্যাধুনিক কবিরা দুর্বোধ্য অস্পষ্ট নিরুত্তাপ আঙ্গিকসর্বস্ব অনেক কবিতাও রচনা করেছেন, আনন্দ বাগচীর কবিতা তার একটি নজির।

জীবনানন্দ থেকে তরুণতর আধুনিক আশিজন কবির রচনায় বিষয়বৈচিত্র্যের চেয়ে আঙ্গিকবৈচিত্র্য বিস্ময়করভাবে লক্ষণীয়। গদ্যছন্দকেই চোখের দেখাতে মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে বিচিত্রতর করা হয়েছে বেশি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুক্তক পয়ারের প্রভাব এযুগে যত বেশি, তত আর কারো নয়। অক্ষম সনেটও সুরহীনভাবে প্রকাশ পায়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রাদুর্ভাব প্রায় নেই বললেই চলে। এযুগে পয়ারজাতীয় অমিত্রাক্ষরই লক্ষিতব্য। ভাষা সৃষ্টিতে দৈনন্দিন জীবনের, এমনকি দৈনন্দিন জীবনের স্ল্যাঙ্ও প্রয়োগ

করা হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়, "চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল", আ মরণ! পোড়ার মুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি! বসন্তের পেলবতার সঙ্গে রূঢ় বাস্তবের আঘাত এমন বৈপরীত্যের সাহায্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, কিন্তু কবিতার প্রকাশে কি বাধা দেয় না। "কাঠখোট্টা গাছ", "সময়ের দিনরাত্রি ডোরা-কাটা বাঘছালে বসে জীবনের ইস্কুল-পালানো?" "কর্কটুকু খুলে", "থোলো থোলো কালো আঙুরের মত রাত, পাতাগুলি কেটে দেয় হাওয়ার করাত", "জ্বরের চিতায় দেহটা পুড়ছে, তার নির্ধুম শিখায় খুলবে না কি সৌরপদ্মের পাপড়ি" প্রভৃতি ভাষা-সংকেত-রূপক-ইমেজ ব্যবহার করায় ভাষার সীমাশক্তি অনেক দূর এগিয়েছে। তবে বিদেশী কবিতার আঙ্গিক অনুসরণ করতে গিয়ে ভাবকে অনেকে চেপে মেরেছেন। ফলে ছোটরূপ পাওয়া যায়, কিন্তু কবিতা পাওয়া যায় না। এযুগেও চার-পাঁচজন কবি ব্যতিরেকে আইডিয়া ইম্প্রেশন ফিলিং-এর ওপর কাব্যের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তাঁদের অনাবৃত ব্যক্তিত্ব এড়িয়ে বুদ্ধি প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু তাতে চিত্ত গভীরভাবে নাড়া দেয় না, মনে হয় জীবনানন্দ ও দিনেশ দাশের মধ্যেই বস্তুরূপ সংকেতের আবেগে ভাষা রূপ পেয়েছে সার্থকভাবে, তাঁদের শত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যক্তিত্বের স্পর্শ ক্ষণিকে আমাদের অন্য জগতে নিয়ে যায়। আর এ সংকলনে অনেক কবি আছেন—যাঁরা কবিতা লিখতে হয় বলেই কবিতা লেখেন।

সংকলনে রবীন্দ্রনাথের 'বিস্ময়' কবিতাটি গ্রহণ শিল্পরুচিসম্মত নয়, যদিও তত্ত্বগ্রাহ্য, জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কেও সেই একই কথা। এই সংকলনে অনেকের কবিতাই আছে—যাতে তাঁদের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু কাব্যরূপ প্রকাশ পায় নি। বিষ্ণু দের কবিতায় আইডিয়া ইমপ্রেশন আছে, কিন্তু কবিতা কতখানি প্রশ্ন উঠবে অনিবার্যভাবে।

তথাপি এজাতীয় কবিতা সংকলন ধন্যবাদার্হ। সংকলনকর্তারা দুজনেই কবি, সুতরাং কবির দৃষ্টিতে একশো বছরের কবিতার রূপ ও পরিবর্তন কতখানি তা বুঝতে কষ্ট হয় না তাঁদের চোখ দিয়ে দেখা সত্ত্বেও।

জীবেন্দ্র সিংহরায় ও শক্তিব্রত ঘোষ সম্পাদিত বাংলা সনেটে একশো বছরের সনেটের বিচিত্র রূপ রীতি প্রকাশ পেয়েছে। লিরিকের অন্য অনেক আঙ্গিক লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু সনেটের ঐতিহ্য আজও প্রবহমান।

জীবেন্দ্র সিংহরায় ভূমিকায় সনেট সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে উজ্জ্বল কবিকৃতি সনেটে কবির গভীর রসচেতনা আত্মস্থ ব্যক্তিত্বের পরিমিতি বোধ ও ভাস্কর-সুলভ শিল্পদক্ষতা থাকা চাই। সনেটে লিরিক প্রেরণার ঝোঁক ক্লাসিক্যাল সংহতির দিকে হওয়া চাই। সংযম সুন্দর ভাবরূপই মনোহরণ করে বেশি। টেকনিকের যাথার্থ্যের ওপরই সনেটের সিদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। পৃথিবীতে তিন প্রকার সনেট তাঁর মতে আদর্শস্থানীয়, পেত্রার্কীয়, শেকস্‌পীয়রীয় ও ফরাসী দেশের বিদ্রূপের কবি Bellay-র সনেট। বাংলা দেশের একশো বছরের প্রায় সব কবিদের সনেটই সংকলন করেছেন, কিন্তু জীবনানন্দের সনেট বর্জন করেছেন, এর পেছনে জীবেন্দ্রবাবুর যুক্তি হল, "জীবনানন্দ দাশের চতুর্দশপদীগুলিরও সনেট হিসাবে নানা দোষ আছে— চরণগুলি অতি দীর্ঘ ও দুয়ের অধিক পর্বসমন্বিত, মাত্রাযোজনাও সর্বত্র বিচারসম্মত নয়।" মাত্রাবৃত্তে রচিত ছন্দে সনেটকেও তিনি বর্জন করেছেন নাচুনে ছন্দ বলে। রবীন্দ্রনাথের সনেটগুলিকে তিনি খাঁটি সনেটের পর্যায়ে ফেলেন নি। এর কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন: "সনেটের উজ্জ্বল রূপায়ব নির্মাণ করতে হলে শুধু রোমান্টিক মনের আত্মস্থতা থাকলেই চলে না, অনেকখানি ভাবকে স্বল্পতর ভাবনার সংহতি দিয়ে একটা নিরেট মূর্তির মধ্যে ফুটিয়ে তোলার জন্য গভীর ও গম্ভীর, সত্য ও সরল পরিমিতি ও চিরায়ত চেতনা থাকা চাই (তবে মহাকবির ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি আর সনেটের ক্লাসিক্যাল ঝোঁক-এর পার্থক্য মনে রেখেই এই কথাগুলো বলা হল)। রবীন্দ্রনাথের তা ছিল না আর ছিল না বলেই খাঁটি সনেট তাঁর হাতে গড়ে ওঠে নি।" জীবেন্দ্র সিংহরায় সনেটে ভাবের আবর্তন নিবর্তনও আবশ্যিক বলে স্বীকার করেছেন।

টেকনিকের বিচারে জীবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই মতে। কিন্তু একটি প্রশ্ন, কবিতা যে আঙ্গিকেই হোক, তা কি শুধু আঙ্গিক-সর্বস্ব কথা। রবীন্দ্রনাথকে সনেটকার হিসাবে স্বীকার না করলে পাশ্চাত্ত্যের অনেক কবিই বাদ যান। আর জীবনানন্দ সনেটে যে-একটি সঙ্গীত প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তা তাঁর ঐ আঙ্গিকেই সম্ভবপর। সনেটে তার যথাবিহিত মিল মাত্রা মেনে চলতে হবে—এমন কোনো কথা নেই। যে-কবি নিহিত টেকনিকে সঙ্গীত প্রকাশ করতে পারেন, তিনি সার্থক অঙ্গ ও অন্তরের সামঞ্জস্যে। কিন্তু অনেকে সনেটের সঙ্গীতাত্মক অখণ্ড ভাবময় মানসী প্রতিমার

আত্মার নিরাভরণ ও নিরাবরণ প্রকাশ করতে পারেন ঈষৎ মিলবৈচিত্র্য ঘটিয়ে, স্তবকবিন্যাস না মেনে, স্বরূপের দিক থেকেই তাকে কবিতা বলব এবং বিশেষ শ্রেণীর কবিতা বলব। আত্মকেন্দ্রিক মনের লিরিক সঙ্গীতই অখণ্ড নিটোল ভাবরূপে সনেটের সংযম সুন্দর আকৃতিতে প্রকাশ পায়। লিরিক সঙ্গীত যেখানে নেই অখণ্ড ভাবরূপের নিটোল সংযম সুন্দর সেখানে স্থাণু ও জড়। তাঁর সংকলনে এমন অনেক সনেট আছে, টেকনিকের দিক থেকে সনেট, ভাবস্বরূপের দিক থেকে ড্রাইডেনের invention বা wit-writing যাকে এযুগের ভাষায় eloquence বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের লিরিক সম্বন্ধে জীবেন্দ্রবাবু মন্তব্য করেছেন: "ভাবের অখণ্ডতায়, প্রকাশের গভীরতায় সেগুলি ঘনপিনদ্ধ অথচ স্বচ্ছরূপ লাভ করেছে।" এ গুণগুলি থাকা সত্ত্বেও কি রবীন্দ্রনাথের সনেটকে বর্জন করব। বিন্যাসের দিক থেকে স্বতন্ত্র নাম দিলেও একে সনেট হিসাবে স্বীকার করব। আর আবর্তন নিবর্তন সনেটে অভাবি নয়। আসলে সনেটে ক্ষুদ্রধ্বনিময় সঙ্গীতে কবির ব্যক্তিত্বকেই আমরা স্পর্শ করতে চাই। Bellay-র কবিতার চেয়ে বোদ্‌লেয়রের Correspondence সনেটটি কাব্যসঙ্গীতগুণে আরো চমৎকার, অথচ তার উল্লেখ তিনি করেন নি। বলা বাহুল্য, সার্থক কবির হাতেই সনেটের সংযম-সুন্দর-রূপ ফুটে ওঠে, অন্যের হাতে টেকনিকের পাহাড়। সাধারণ কবিতার মতো সনেটেও কোলরিজের মতে থাকতে হবে এবং একান্তভাবেই থাকতে হবে: Could I revive within me / Her symphony and song. / To such a deep delight 'twould win me / That with music loud and long / I would build that dome in air / That sunny dome ; those caves of ice.

রবীন্দ্র-অভিধান

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

রবীন্দ্র-চিহ্নিত বৎসরের এখন মধ্যকাল। রবীন্দ্র-উৎসবের তরঙ্গ এখন উত্তুঙ্গ। নানা তার আয়োজন, বিচিত্র তার প্রকাশ। এই তরঙ্গ-শীর্ষে থেকেও ঘণ্টাবাদ্য-মাইক-ধ্বনির মধ্যেও অনেক-সময়ে আমাদের নিভৃত মনের কোণে এ কথা উঁকি দেয় যে অনেক কিছু যা করণীয় ছিল, তা করা হয় নি। পূর্ণতর রবীন্দ্র-জীবনীর উপকরণ সংগ্রহের জন্য সংহত যৌথ প্রচেষ্টার উদ্যোগ নেই ; বিদেশে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ, কার্যকলাপ ও সাহিত্যিক অভ্যর্থনার বিবরণের বৃহৎ একটা অংশ, এই সময় ভারত সরকারের সামান্য উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছ থেকে সংগৃহীত হতে পারত ; ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের সুষ্ঠু অনুবাদের ব্যবস্থা আজও হয় নি ; রবীন্দ্র-কল্পিত জনশিক্ষার প্রসার রুদ্ধপ্রায়। এই গেল এক দিক। অন্য দিকে, অনেক উৎসব-অনুষ্ঠান আছে যার লক্ষ্যই সাময়িক। সুতরাং বৎসরব্যাপী দীর্ঘ তরঙ্গটি যখন অপসৃত হয়ে যাবে তখন আমাদের তীরভূমিতে কী পড়ে থাকবে তা বলা খুব মুস্কিল।

এই অবস্থার মধ্যে যাঁরা স্থায়ী ও পাকা বনিয়াদের কাজে হাত দিয়েছেন তাঁরা বিশেষভাবে ধন্যবাদের পাত্র। সোমেন্দ্রনাথ বসু এই রকম একটা কাজ শুরু করেছেন। একটি সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-অভিধান তাঁর অভীষ্ট। পাশ্চাত্যের কোনো কোনো লেখক সম্পর্কে যেমন 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' জাতীয় গ্রন্থ আছে এরও পরিকল্পনা অনেকটা তেমনি।

বছর কয়েক আগে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন শুনেছিলাম অনুরূপ পরিকল্পনা তাঁরও ছিল। তিনি অবশ্য—হয়তো বার্ধক্যের জন্যেই নিজে করতে চান নি, করাতে চেয়েছিলেন। একদল তরুণ উৎসাহী কর্মী পেলে তাঁদের সাহায্য করবার জন্যও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। (সোমেনবাবু ভূমিকায় জানিয়েছেন

* **রবীন্দ্র-অভিধান** (প্রথম খণ্ড)। সোমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ। ছ টাকা।

যে তিনি পত্র-মাধ্যমে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য পেয়েছেন।) প্রভাতবাবু তাঁর এই পরিকল্পিত কোষগ্রন্থের নাম মনে ভেবে রেখেছিলেন, 'রবীন্দ্র-ভাব-সূচী'। বলা বাহুল্য, এ পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নি।

কোষ-কেন্দ্র সংকলন অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ, এবং সময়সাপেক্ষও বটে। এর দ্রুত সুষ্ঠু সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল সরকারের, বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সাহিত্য পরিষৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের। কিন্তু তাঁরা যখন নিদ্রাভিভূত, তখন ব্যক্তিগত উদ্যোগ দুঃসাহসী হলেও কাম্য, দুর্বল হলেও প্রশংসার্হ। সেই দুঃসাহসিক প্রশংসনীয় কাজে হাতে দিয়েছেন সোমেনবাবু।

এ কাজ যে কতটা সময়-শ্রম-সাপেক্ষ, তা এই খণ্ডটি দেখলেই বোঝা যাবে। এই খণ্ডটিতে অভিধানের মাত্র একটি বর্ণ 'অ' সমাপ্ত হয়েছে। বোঝাই যায়, চন্দ্রবিন্দুতে পৌছতে সময় লাগবে।

এই ধরনের কাজে যে দুর্বলতা থাকতে পারে, কিছু বাদ পড়তে পারে, এ সম্পর্কে সোমেনবাবুও সচেতন। তাই তিনি পাঠকদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নতুন কথা শোনাবো এমন ক্ষমতা আমার নেই। কত মনাষী তাঁর কথা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর সৃষ্টিকে নানাভাবে বোঝবার চেষ্টা করেছেন।···অল্পসাধ্যে সাগরসিঞ্চন দুঃসাহসের কাজ। তবু যাঁকে নিয়ে এই চেষ্টা তাঁর প্রতি একান্ত অনুরাগই এ কাজে হাত লাগাবার প্রেরণা। ভুল ত্রুটি থাকবেই।"

যতদূর সম্ভব প্রত্যেকটি গান, গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও চরিত্রের তথ্যগত পরিচয় দান অভিধানাকারের উদ্দেশ্য, সমালোচনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ভূমিকাতেও একথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমার সাধ্য অল্প। ভাব ও ভাবনায় যিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ তাঁর কি পরিচয় আমি দিতে পারবো। আমি শিক্ষক, ছাত্রদের নিয়ে আমার কাজ। তাই এই কথাই মনে হয়েছে এমন কিছু করা আমার দরকার যাতে পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথ পড়তে সাহায্য পান। তাই এই অভিধানের চেষ্টা। অভিধানের কাজ অর্থ পরিস্ফুট করা—সমালোচনা নয়। তাঁর বিভিন্ন রচনার অর্থ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছি। আশা করেছি প্রবেশপথে এই সাহায্যটুকু পেলে পাঠকদের নিজের মনের মত অর্থ ও রসগ্রহণের সুবিধা হবে।"

তা হলেও "বিভিন্ন রচনার অর্থ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা" করতে গেলে একটা

দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যাকারের থাকেই এবং সেই সূত্রে মতান্তরেরও অবকাশ থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সোমেনবাবু অতি উদার একটি দৃষ্টিতে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন এইভাবে: "দেশাচার ও রক্ষণশীল ধর্মের গোঁড়ামী থেকে বাংলার নব জাগরণের নেতা রামমোহন মানুষের আচ্ছন্ন বুদ্ধিকে মুক্তির পথ দিয়েছিলেন। সেই মুক্ত বুদ্ধির প্রচণ্ড কর্মীরূপ দেখেছি বিদ্যাসাগরের মধ্যে—তারই সর্বাঙ্গীণ পূর্ণ বিকাশ দেখলুম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। মুক্ত বুদ্ধি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির মিলনে যে অসাধারণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তির জাগরণ দেখলুম, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার তাই হলো যথার্থ পরিণতি।"

এরও পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের আর একটি দিক—হয়তো মহত্তম দিক—থাকে, যেখানে তিনি শিল্পী। সেই শিল্পী-পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা দুরূহ, হয়তো অভিধানের সীমার কিঞ্চিৎ বাইরেও। তাহলেও সে-চেষ্টা সোমেনবাবু করেছেন। অন্তত সেই শিল্পীমহলে পৌছবার বাহ্য বাধাগুলিকে নিপুণভাবে সরাবার চেষ্টা করে পাঠককে সেই মহলের প্রান্তে এনে তার অন্তঃপুরের আভাস দিয়েছেন। এ কথা অবশ্য সত্য যে এ কাজ পূর্বসূরীরা অনেকটাই করে গিয়েছিলেন। সোমেনবাবু তাকে গুছিয়ে দিয়েছেন। তাতে সাধারণ পাঠকের প্রভূত উপকার হবে।

সোমেনবাবু মুখ্যত নিরঞ্জন-তথ্যাশ্রয়ী, অথবা উদ্ধৃতিচিহ্ন সম্বলিত অন্যমত-উদ্ধারকারী। একটি ক্ষেত্রে এর ঈষৎ ব্যতিক্রম ঘটেছে। কবিতাটি 'সানাই'-এর 'অপঘাত' (প্রথম পংক্তি : সূর্যাস্তের পথ হতে)। এটি কবি রচনা করেন ১৯৪০-এর ২৯শে মে। এই কবিতাটির আলোচনা সোমেনবাবু শুরু করেছেন এই ভাবে: "১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে কবি সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত ছিলেন। রাশিয়াকে তীর্থ বলে উল্লেখ করেছিলেন। সেই রাশিয়া যখন ফিনল্যাণ্ডের মতো একটি ছোট দেশকে আক্রমণ করলো, বোমার দ্বারা বিধ্বস্ত করলো তখন তাঁর ধারণাতেও আঘাত লাগলো। অপঘাত সেই আঘাতের কথা।"

আলোচনা শেষ করছেন এই কথাগুলির পুনরুক্তিতে: "একদিন রাশিয়ার আদর্শ তাঁর মন স্পর্শ করেছিল—সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর ভাল লেগেছিল। সেই রাশিয়া যেদিন ক্ষুদ্র ফিনল্যাণ্ডের উপর বোমাবর্ষণ করলো সেদিন তাঁর মনে আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করা কঠিন নয়। চৈত্রের দিনের এই টেলিগ্রাম একটি শান্তপরিবেশকে ছিন্নভিন্ন করেছে।

মনের শান্তি নষ্ট হলো—এই নির্মমতায় বিক্ষুব্ধ কবির আর কিছুই বলার নেই।"

প্রথমত, দু বার প্রায় একই কথা বলার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বিষয়ের গুরুত্বের দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ। দ্বিতীয়ত, "সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর ভাল লেগেছিল", একথা সঙ্কীর্ণতা-দোষ-দুষ্ট। কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর দ্বিধা ছিল; কিন্তু শিক্ষা তো নিশ্চয়ই, রাশিয়ার সমাজের অন্যান্য অনেক বিষয়ও তাঁর প্রশংসা অর্জন করেছিল। কিন্তু এহ বাহ্য। তৃতীয় এবং প্রধান কথা, ফিনল্যাণ্ড-বোমাবর্ষণের ঘটনাটি তার সামগ্রিক প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যাতে রাশিয়া সম্পর্কে ঘৃণা বা বিরাগ জাগা সাধারণ পাঠকের পক্ষে স্বাভাবিক। এখানে অভিধানকারের রাজনৈতিক চিন্তার ছায়া পরোক্ষে পড়েছে। শেষ কথা, ফিনল্যাণ্ডের ঘটনার পরে, যুদ্ধের অবস্থা পরিষ্কার হলে, দেখা গিয়েছে কবির সোবিয়েতের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ ছিল। এ কথাটিও তাহলে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল।

নিছক সাহিত্য-প্রসঙ্গেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সোমেনবাবু তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। নাটকের গান বা গল্প-উপন্যাস-নাটকের কোনো কোনো চরিত্র সম্পর্কে সোমেনবাবু তাদের প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে মত দিয়েছেন। এটি বোধহয় অভিধানকারের কাজ নয়, সমালোচকের কাজ। এখানে মতান্তরের সম্ভাবনাও প্রবল থাকে, সোমেনবাবু তথ্যগুলিকে যথাযথ দিয়ে বরং পরিশিষ্টে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে ঐ বক্তব্যগুলিকে উপস্থিত করতে পারতেন।

সোমেনবাবুর লেখার ভঙ্গি—অন্তত এ বইতে—কিছুটা শিথিল। অতি-বিশদ ব্যাখ্যা করবার ঝোঁক—এর একটা কারণ। বহু চরিত্র-আলোচনায় সোমেনবাবু বিস্তৃত গল্পপটে তাকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এতে অবশ্য খুব প্রাথমিক ধরনের পাঠকের কতকগুলো সুবিধা আছে। তা সত্ত্বেও মনে হয়েছে যে ঐ জাতীয় অনেক যায়গা সংক্ষিপ্ত করা যেত এবং অভিধানের কাছে বোধহয় সেটাই কাম্য। পাতার কথা ভাবলেও এ কথাটা মনে হয়। এখানে দেখলাম কোনো কোনো ছোটগল্পের একটি চরিত্রের আলোচনায় তিনি দিয়েছেন তিন, চার বা হয়তো পাঁচ পৃষ্ঠা। এর বাকি চরিত্র এবং স্বয়ং গল্প যখন তাদের ভিন্ন ভিন্ন আদ্যক্ষরের সূত্র ধরে অভিধানে এসে আবির্ভূত

হবে, এবং ঐ অনুপাতে পাতা দাবি করবে, তখন একটি ছোটগল্পের আভিধানিক পরিচয় কী সুবৃহৎ হয়ে যাবে তা সহজেই অনুমেয়। এমন লেখা নিশ্চয়ই থাকতে পারে যার দাবিই বৃহৎ, তার জোরেই সে সেটা আদায় করে নেবে। এদের কথা স্বতন্ত্র। সেক্ষেত্রে পাতা বেশি না দিয়ে উপা নেই। কিন্তু বহু যায়গায় এত বেশি দাবি থাকবে না—বিশেষ করে যখন একটা গল্পের আলোচনা একাধিক দৃষ্টিবিন্দু থেকে অগ্রসর হয়ে করা হচ্ছে।

বাদ যা পড়েছে তার ছুটো-একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করি, দু-একটি কবিতার বই আছে যাতে কবিতার কোনো নাম দেন নি কবি, নম্বর দিয়েছেন স্বভাবতই প্রথম পংক্তি এর পরিচায়িকা। 'লেখন' বইটা আরো নিরাভরণ নাম-পরিচয়হীন দু-চার লাইনের কবিতার সংকলন এটি। এর গুরু রবীন্দ্রসাহিত্যে কম, তবু অভিধানে তার স্থান থাকা উচিত। এই বই একেবারে অবহেলিত হয়েছে। 'কণিকা'-র দু-চার লাইনের কবিতাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সুতরাং 'লেখন'-ও বাদ পড়া উচিত নয়। 'উৎসর্গে' ৪৫নং কবিতাটি (অত চুপি চুপি কেন কথা কও) দেখতে পেলাম না 'উৎসর্গে'র সংযোজন অংশের ১০ নং কবিতাটিও (অচির বসন্ত হায় এল, গে চলে) নেই।

বানানে 'কর্চ্ছে', 'পার্চ্ছে' ইত্যাদি ব্যবহারের প্রয়োজন কী! রেফ-এ সঙ্গে যুক্ত দ্বিত্ব-বর্জন আজ সর্বত্র স্বীকৃত। এক্ষেত্রে সেটা রাখবার সার্থকতা দেখি না।

মুদ্রণ-প্রমাদ দুর্লক্ষ্য নয়, যা অভিধানে অবাঞ্ছিত।

শুধু 'অ'-র ঘরে দাঁড়িয়ে গোটা বই-এর বিষয়ে কিছু বলা অসম্ভব। কি সূচনা শুভ সন্দেহ নেই। ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলিও যাতে ভালো হয়, তার জন্য আমাদের এই সমালোচনা।

এই বিপুল ও মহৎ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সোমেনবাবুকে অভিনন্দন জানাই।

রবীন্দ্র-প্রতিভা ও রবীন্দ্র-চিত্রকলা

গোপাল হালদার

শোনা যায়, ইউরোপ-আমেরিকার সংস্কৃতিবাদীরা রবীন্দ্রনাথের নামই প্রায় আজ স্মরণ করতে পারেন না—রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে পরিচয় তো দূরের কথা। কথাটা অনেকাংশে পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে সত্য, এবং ঠিক তেমনি পূর্ব ইউরোপের পক্ষে সত্য নয়—এরূপ বিশ্বাস করবার কারণ আছে। বলা হয় পশ্চিম ইউরোপের এই অজ্ঞতার কারণ তাঁদের ঔদাসীন্য বা বিমুখতা নয়; কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ও অন্যকৃত অনুবাদের ত্রুটি। কেউ কেউ আমাদের বুঝিয়ে বলেছেন—কবিতার অনুবাদ হয় না। এই মৌলিক তর্ক এ উপলক্ষে নিরর্থক। কারণ, রবীন্দ্রনাথ কবিতা ছাড়াও আরও কিছু কিছু জিনিস লিখেছেন। অনুবাদের বাধা ডিঙিয়েও আমরা যদি ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় প্রভৃতি সাহিত্যিকদের দানের পরিচয় গ্রহণে চেষ্টা করতে পারি, তা হলে 'পাশ্চাত্ত্য' পৃথিবীর বিপুলতর সাংস্কৃতিক-সমাজে ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান মানুষের এত অভাব কেন, যে, তাঁদের মধ্যে দু-একজনও বাঙলা ভাষা শেখার ও তার থেকে অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না? এবং তদভাবে রসজ্ঞ পাঠকেরই বা এত অভাব কেন যে অনুবাদের বাধা ডিঙিয়ে রবীন্দ্র-গদ্য-সাহিত্যের রস গ্রহণে তাঁদের উৎসাহ নেই? মানতেই হবে—'পাশ্চাত্ত্য' রসিকদের এখনো পূর্বদেশীয় জ্ঞানী-গুণীর প্রতি অবজ্ঞা আছে। এ ক্ষেত্রে হয়তো আরও কারণ আছে:—পূর্ব-ইউরোপে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক সকল দেশে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে—কই, অনুবাদের বাধায় তো তাঁরা হার মানেন নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মানবীয় মাহাত্ম্য তাঁদের নিকট যেমন সশ্রদ্ধ আদরের বিষয়—'ফ্রি ওয়ার্লড্'-এর নিকট তেমনি তা দিনের পর দিন অস্বস্তিকর।

---

*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রমালা। ললিতকলা আকাদেমি। পঁচিশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রমালা। টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি। আট টাকা।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের অর্থানুকূল্যে মন্ত্রিবর হুমায়ুন কবীর সাহেবের ভূমিকা
নির্বাচিত রবীন্দ্র প্রবন্ধ-খণ্ড ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবা
এরূপ একখণ্ড রবীন্দ্র-সংকলন গ্রন্থ ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীও আমেরিকা
সম্পাদনা করেছেন। ইংরেজী জানি না, কিন্তু মনে হয় কোনটিই অযোগ্য
অনুবাদ নয়। এ সব গ্রন্থের কতটুকু সমাদর হয়েছে আমেরিকায়? 'নি
ইয়র্ক টাইমস্' তো ভারতীয় সাহিত্যে জন্মান্ধ ভারতীয় যুবককে দিয়ে দু-চা
লাইনে অমিয় চক্রবর্তীর সংকলন সমালোচনা করিয়েছেন, আর তা
অবজ্ঞাভরে রবীন্দ্রনাথকেও বাতিল করে দিয়েছেন। 'লাইফ্'-এর সাংবাদিক-
সম্রাটরা শান্তা রামারাও-এর মতো এক বর্ণ-জ্ঞানহীন "বিদুষীকে" দিয়ে আজ
রবীন্দ্র-কথা প্রচারিত করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে মনে হবে—
'কোয়েস্ট' বা 'ফ্রিডম্ অব্ কালচার'-এর 'ফ্রি-ওয়ার্লডী' বাঙালী পাণ্ডারা
নিতান্তই দৈবক্রমে সুধীন্দ্র-বুদ্ধদেবীয় গবেষণা প্রকাশ ও প্রচারের ব্যব
করেন নি। এ বিষয়ে একটা 'মেথড্' আছে।

যাক সে তত্ত্ব, কিন্তু বিদেশীয়দের পক্ষে ভাষা না জেনেও কি রবীন্দ্র-
প্রতিভার পরিচয় গ্রহণ অসম্ভব? সাহিত্য ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত, নৃত্য-
নাট্য ও চিত্রকলায়ও আপনার প্রতিভার কিছু স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। সঙ্গী
ও নৃত্যনাট্যও কি নিতান্তই 'দুর্গম'? তাও যদি হয়—রবীন্দ্র-চিত্রকলাও তা
আর এক পরিচয়—সে প্রতিভা তাতেও পরিদৃশ্যমান। দেশীয়-বিদেশী
পংক্তিবিভাগ তো শিল্পকলার এই ক্ষেত্রে অন্তত অচল। সে সম্বন্ধে কি
বিদেশীয়রা উদাসীন, না, দুষ্প্রাপ্য বলেই বৈদেশিক সাংস্কৃতিক জগতে ত
অজ্ঞাত? সে অভাব তা হলে সম্প্রতি দূর হল—ললিতকলা আকাদেমি ও
টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি (লিমিটেড্) সে বাধা সর্বসাধারণে
সামনে থেকে অপসারিত করলেন। টাটা কোম্পানির প্রকাশনে আছে ১২খানি
সুমুদ্রিত চিত্র। একাদেমির এই সাধারণ-লভ্য প্রকাশনে আছে ৪০ খান
চিত্র (বিশেষ প্রকাশন আমরা হয়তো চক্ষেও দেখতে পাব না)—তাতে
পৃথ্বীশ নিয়োগী মহাশয় একটি সুযোগ্য (কিন্তু সুখপাঠ্য নয়) পরিচয়-নিবন্ধ যো
করেছেন। মুদ্রণে গ্রন্থ-সজ্জায় সব রকমেই তা সমাদর লাভ করবার মতো।

ইং ১৯২৮-এর কাছাকাছি রবীন্দ্রনাথ যখন হঠাৎ চিত্রাঙ্কনে মেতে উঠলে
তখন আমরা অনেকেই কৌতুক বোধ করেছি, অনেকেই বিমূঢ় হয়েছি, কে

কেউ সেই কবি-কর্মকে "ছবিতা" বলে তখন মূঢ়তারও প্রমাণ দিতে ছাড়ি নি। একজন শিল্পরসিক সশ্রদ্ধ মনে ভিকতর হুগোর চিত্রকলার নিদর্শন সামনে নিয়ে ভাবতে বসেছিলেন—ফরাসী কবির সে প্রয়াসই কি রবীন্দ্রনাথকে নতুন পথে পদার্পণে উৎসাহ জুগিয়েছে? তাহলেও ফ্রান্সের শিল্প পরিবেশ আর বাঙলার শিল্প-পরিবেশ এক কেন, সমতুল্যও যে নয়! সংশয়মুক্ত তিনি হন নি। আরও দু-এক জন শিল্পরসজ্ঞ তখনকার দিনেও কবির কিছু কিছু চিত্রকে, কিছু কিছু প্রচেষ্টাকে যে সপ্রশংস চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন, তাও সত্য। ত্রিশ-তেত্রিশ বৎসর পরে আজ তাই শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর শিল্প-দৃষ্টিকে প্রশংসা করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো সর্বগ্রাহ্য না হলেও রবীন্দ্রনাথের শিল্পকলা আজ এদেশেও সকল মানুষের বিশেষ দর্শনীয়; রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়ে তা আরও এক গুরুতর অভিজ্ঞান। চিত্রকলা সম্বন্ধে ধারণা ইতিমধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে, শিল্পীসমাজে এককালের 'নব্যভারতীয় চিত্রকলা' পদ্ধতি—কতকটা ন্যায্যভাবে এবং আরও বেশি অন্যায্যভাবেই অবহেলিত। সেদিনের সেই 'নব্যভারতীয় পদ্ধতি'র স্থলে বোম্বাই-দিল্লী থেকে কলকাতা পর্যন্ত 'মডার্ন আর্টের' চতুর ব্যাপারীরা আসর জাঁকিয়ে বসলেই বা কি? মানতে হবে শিল্প সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে—শিক্ষাও অগ্রসর হচ্ছে। বলা বাহুল্য, সাধারণের পক্ষে শিক্ষার পথ—ছবি দেখা, বেশি করে ভালো ছবি দেখা, ভালো করে দেখা, জানা, বুঝা, বারে বারে দেখা। আর মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারি ও প্রদর্শনীর পরে মুদ্রিত প্রতিলিপিই শিল্পশিক্ষাগার ও শিল্পশিক্ষার বাহন।

ইং ১৯২৮ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রায় ২০০০ (দু হাজার) ড্রয়িং ও চিত্র অঙ্কন করেন। তার প্রায় ১,৫০০ দেড় হাজার (না ১,৮০০?) বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্র-সদন'-এ সংগৃহীত হয়ে আছে। কিন্তু তা যে যথোপযুক্ত ভাবে তালিকাবদ্ধ ও সজ্জিত হয় নি তা বুঝা যায়, কারণ চিত্রসংখ্যাও সঠিকভাবে স্থির হয় নি। তাছাড়াও অন্যত্র নানা প্রতিষ্ঠান ও ভাগ্যবান ভাগ্যবতীদের আয়ত্তেও কবির অনেক চিত্র আছে, তার কিছু চিত্র এ বৎসর কলকাতায় আকাদেমি ভবনে প্রদর্শিত হয়েছে—দেখবার সুযোগও অনেকে লাভ করেছেন। সত্য বটে, রবীন্দ্রনাথের চিত্র দেখা এখনো এদেশে দুর্ঘট নয়, কিন্তু যে ভাবে দেখা সত্যকারের রসগ্রহণের পক্ষে প্রয়োজন—বারে বারে দেখা—

অনেকেই তা লাভ করতে পারেন না। কাজেই, মুদ্রিত প্রতিলিপি-মালায় বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিদেশীয় কেন, দেশীয় লোকরাও এই প্রতিলিপি-মালাদ্বয়ের জন্য প্রকাশকদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবেন।

সম্প্রতিকালে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে—শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বহু সভা, গ্রন্থ ও পত্রাদি সেরূপ আয়োজন করেছিলেন। 'পরিচয়'-এ (মাঘ ১৩৬৭) শ্রীযুক্ত সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র চিত্রে আধুনিকতা ও ঐতিহ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে যোগ্যতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন—পাঠকবর্গের তা স্মরণে থাকবার কথা। অন্তত আমরা দুর্বোধ্য কথা বা মামুলী ভাষ্য না বাড়িয়ে পুনর্বার সে প্রবন্ধ পাঠ করবার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করব।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রমালা যে প্রশ্ন খুব ন্যায়সঙ্গতভাবে মনে জাগিয়ে তোলে তাঁর কবিতা বা সাহিত্যে তার আভাস বিশেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু এ চিত্রাবলী শুধু কলা-বিশারদদেরও যেমন একান্ত বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যের বিষয় হওয়া উচিত নয়, তেমনি চেতন ও অবচেতন মনের উৎসাহী সন্ধানীদেরও আপ্ত-বচনের বিষয় হওয়া ঠিক নয়। নিশ্চয়ই এ কলারও বিকাশ-ইতিহাস আছে। কবিতার লাইন কাটতে কাটতে যা এগিয়ে গেল জানা-অজানার কিম্ভূতের রাজ্যে—সেখানেই তার শেষ নয়।

> "This was, however, not a changeless state. Even the most persistent themes underwent a development in the direction of increasing characterization, and of importation of definite personality to each image. The development clearly moved away from the direction of abstraction." (Sri Prithvis Neogy)

কবির ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবেশের মধ্য থেকে স্মৃতি কী উদ্ধার করতে চেয়েছিল তা যেমন জিজ্ঞাস্য, তেমনি একথাও স্মরণীয়ঃ ইং ১৯৩০—১৯৪১ পর্যন্ত কালটি রবীন্দ্র-চেতনা যুগ-চেতনার সংঘাতে-সংকটে কীভাবে মথিত, আলোড়িত হয়েছিল। সমগ্রভাবে না দেখলে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই প্রকাশও সম্যকভাবে দেখা হয় না। কারণ একথাটাও গভীরভাবেই সত্য: "Rabindranath Tagore had come to belong fully to the world of his time, the modern world." এই রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ। বলা বাহুল্য এই মডার্ন ওয়ার্লড্ "ফ্রি" ওয়ার্লড্ তো নয়ই, তথাকথিত 'পাশ্চাত্ত্য' জগতে নয়—তা আধুনিক মানুষের জগৎ।

একটি সাম্প্রতিক উপন্যাস

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন দিন তিন রাত্রি* নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাম্প্রতিক উপন্যাস।

মনোমোহনবাবুর কলকাতার বাসায় তাঁর পরিবারস্থ পরিজনদের মধ্যে, পূর্ব সম্পর্কের সূত্র ধরে, দারোগা অসীম, রাইটার্স বিল্ডিঙে কার্যব্যপদেশে, তিন দিনের জন্য অতিথি হয়ে উঠেছিল। অসীম ছিল মনোমোহনবাবুর বড় ছেলে শঙ্করের বন্ধু, পরে সে ভালোবেসে ফেলেছিল সেজ মেয়ে মানসীকে। অসীম দাশগুপ্ত, মানসী মুখোপাধ্যায়; এবং দাশগুপ্ত অসীম কাঞ্চন কৌলীন্যেও ন্যূন। স্বাধীন বিবাহের ওপর মনোমোহনবাবুর অসন্তোষ যথেষ্ট, সম্প্রতিকালে সে অসন্তুষ্টির আরো বৃদ্ধি ঘটেছে পুত্র শঙ্করের স্বাধীন প্রেমজ বিবাহে। এবং তার পরিণতিতে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক-ছেদে, শঙ্করের পৃথক হয়ে যাওয়ায়—এই মনোভাব তিক্ততম হয়ে উঠেছে। মাধুরী মনোমোহনবাবুর মেজ মেয়ে। অসীমের সঙ্গে তার কোনো হৃদয়গত সম্পর্ক বর্তমান সাক্ষাৎকারের পূর্বে ছিল না। কেননা ও ছিল মানসীর ভাষায় "উদাসিনী"। এই পরিবারে, শঙ্কর না থাকা সত্ত্বেও, মানসীর সঙ্গে অসীমের সম্পর্কের কথা সকলের কাছেই প্রকাশিত থাকা সত্ত্বেও, অসীম তিন দিন তিন রাত্রি কাটাল। সেই তিন দিন তিন রাত্রিই উপন্যাস। মাধুরীর যে-আকর্ষণ সে অনুভব করল, মানসীর যে-নব রূপ সে আবিষ্কার করল—এবং উভয়ের টানাপোড়েনে যে-গ্রন্থিমোচন মাধুরীর হাত দিয়েই ঘটল—নরেনবাবু তা যথেষ্ট খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসটির প্রথমাংশে, অসীমের দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরে মনোমোহনবাবুর পরিবারের নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে অসীমের পরিচয়লাভ বর্ণিত হয়েছে; ফাঁকে ফাঁকে জীবিকার সঙ্গে অসীমের অমিলটুকুও বলা হয়েছে। মানসী সম্বন্ধে অসীমের ব্যর্থতাবোধ থেকে, এবং মাধুরীর সাময়িক ভ্রান্তি-জাতীয় কিছু অন্যতর আকর্ষণে, শঙ্করের ছেলের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ থেকে ফেরার পথে, বৃষ্টির রাত্রে ট্যাক্সিতে মাধুরীকে অসীম চুম্বন করে—এইটা

* **তিন দিন তিন রাত্রি**। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। পাঁচ টাকা।

উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশ বা মধ্যম ভাগ। এখান থেকেই সমস্যার ঘনীভবন। মাধুরী এবং অসীমের একত্র ট্যাক্সি ভ্রমণের রহস্য নারীসুলভ অনুমান ক্ষমতায় মানসী কিছুটা আঁচ করে। ঘুমের ঘোরে সে বলে ওঠে—"দিদি তুই কি করলি" ? তাই নন্দুর পরীক্ষায় ব্যর্থতাজনিত সাময়িক অন্তর্ধানের শেষে নন্দুর পুনরাবির্ভাবের পরে মাধুরী মনোমোহনবাবুকে বলে—মানসী আর অসীমের এক বছর হল বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মাধুরীর এই মহৎ মিথ্যোক্তির সাহায্যে ঘটনা মানসীর দিক থেকে সরল হয়ে গেল। সেই সরলীভবনের মধ্যেও কতখানি বেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা রইল সে কথা জানিয়েই উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নরেনবাবুর অনুচ্চভাষী, কিন্তু উজ্জ্বল গদ্য, কাহিনীর আধার হিসাবে সার্থক—যদিও এইবার তাঁর লেখায় কিছু কিছু মুদ্রাদোষ পরিলক্ষিত হয়েছে।

লেখকের দিক থেকে উপন্যাসটির ন্যায়-শৃঙ্খলা এই : অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন, প্রতিযোগিতাবিমুখ যুবক। সে ভালোবেসেছে মানসীকে, যে মানসী আচার-আচরণে অনেক দৃঢ় এবং স্পষ্ট। মানসীকে বলিষ্ঠ মুঠিতে আঁকড়ে ধরার মতো সাহস এবং অভিপ্রায়—দুয়ের কোনোটাই অসীমের নেই। কাজের ছুতোয় কলকাতায় এসে মানসীদের বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণে তার অনিচ্ছা যে প্রবল হল না সেটার কারণ মানসীর প্রতি তার ভালোবাসা। মানসীদের বাড়িতেও যে তার জন্যে স্নেহাসন রচিত হল তার বিভিন্ন কারণ অমূলক নয়। মনোমোহনবাবু এবং সুহাসিনী দেবীর কাছে অসীম পারিবারিক আত্মীয়-তুল্য। যার কাছে শঙ্করের যাবতীয় দুর্ব্যবহারের কথা মন খুলে বলা চলে। মাধুরীর কাছে, মঞ্জুর কাছে, অসীম বোনের ভালোবাসার পাত্র। নন্দুর কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু অসীম এ বাড়িতে এসে আবিষ্কার করল যে মাধুরী অনেক শান্ত করুণ—মানসীর উজ্জ্বল স্পষ্টতা তার কাছে প্রায় দুরাকাঙ্ক্ষার সামিল। মানসীর শুভাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক প্রিয়গোপালবাবুরা অসীমের কাছে অনেক-দূরের-মানুষ। উপন্যাসের যা কিছু সমস্যা যথা মাধুরী-মানসীর দ্বন্দ্ব, তা এই পথ ধরে আবির্ভূত হয়েছে। যদিও সমস্যার অন্য মুখটা মাধুরীর দিকে ফেরানো—তথাপি মাধুরীর আংশিক সাফল্যকে লেখক বড় বোনের আত্মত্যাগের উর্ধ্বে তুলতে পারেন নি। আবার, মনে রাখা দরকার অসীম-প্রসঙ্গেই দুই বোনের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে ম্লান ছায়া এসে পড়েছিল, তাই অসীমের নায়ক ভূমিকা এই উপন্যাসে শুধুই একটা উপায় নয়। অসীমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েই এই বোনেরাও স্পষ্ট হবে।

সেক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন হবে অসীমকে কতদূর স্পষ্ট করে নরেনবাবু গড়ে তুলেছেন ? অসীমের রূপের স্পষ্টতার জন্য তার জীবিকার ও জীবনের অসঙ্গতি, অমিল ও দ্বন্দ্বটুকুকে যে ব্যবহার করা প্রয়োজন—সে সম্বন্ধে লেখক সচেতন ছিলেন। এবং তিন দিন তিন রাত্রির আখ্যানে বারে বারে ঘুরে ঘুরে দারোগা-অসীমের ব্যর্থতার প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। এইখানে, উপন্যাসের সবাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ভিত্তিভূমি রচনার সময়েই, লেখক দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। অসীম নরেনবাবুর প্রিয়-নায়কমণ্ডলীর অন্তর্গত। ছিমছাম, শান্ত, ধীর, সৌখীন, ভদ্র, নাতি-উজ্জ্বল এবং নাতি-ম্লান, বাকপটু, মেয়েদের আদর আপ্যায়ণ গ্রহণ করার ও বহন করার ক্ষমতায় শরৎচন্দ্রের নায়কের স্মৃতি-বহ—এই হল অসীমদের পরিচয়। নরেনবাবু নায়কদের 'নায়কিয়ানা' এবং নায়িকাদেরও 'নায়িকা-পনা' পছন্দ করেন না। অসীম নানা চিন্তায় জটিল ; সভ্যতা ও সমাজ সংক্রান্ত বিশেষ ভাবনায় ভারাক্রান্ত নায়ক নয়। এমনকি নিজেকে নিয়েও তার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। কিন্তু প্রশ্নচিহ্ন-হীন এই নায়কের—গেরুয়া-পাঞ্জাবি গায়ে গৌরদেহ এই দারোগার, সমস্যাটা তাহলে কোথায় ? সে ভাবছে যে মানসী তার কাছে দুরধিগম্য—কেননা সে অনুজ্জ্বল দারোগা। এই ভাবনার মূল কোথায় ? এটা যে-প্রসঙ্গ-প্রকরণের পথে ব্যক্তির অনুভবগম্য বেদনার জন্ম দিতে পারে, তার অবর্তমানতায় সমস্ত জিনিসটাই হয়ে দাঁড়ায় এক তাৎপর্যবিহীন বেদনা। অথচ অসীম, সকল প্রশ্নচিহ্নের কবর ঘটেছে যার মধ্যে, যে ভাগ্যের কাছে সকল দিক দিয়ে মারখাওয়া, সে-ধরনের নির্বাপিত ভস্মশেষও নয়। সে ভস্মশেষ নিয়ে নাড়াচাড়া করাও নরেনবাবুর অভিপ্রায় নয়। তাই একদিকে অসীমের ব্যর্থতার চেহারা পঙ্গু—অন্যদিকে তার প্রেমের চেহারায়ও লুব্ধতার দৈন্য।

মাধুরী এবং মানসীকে চরিত্র-ন্যায়ের কঠিন ভিত্তিতে স্থাপিত করলে, অসীম-ঘটিত দুর্বলতার হাত থেকে উপন্যাসটিকে অংশতঃ রক্ষা করা যেত। লেখকের দৃষ্টি সেদিকেও যায় নি। কতকগুলি ভালো ভালো 'পরিস্থিতি' আছে বটে, যেমন ছাদে বেড়ানো, তন্দ্রাতুর অসীমের কপালে মাধুরী বা মানসী কারো একজনের হাত বুলিয়ে দেওয়া (অসংখ্য পাঠক ও পাঠিকার কৌতূহল-বহ্নি এখানে লেলিহান হয়ে উঠবে—কে হাত দিয়েছে কপালে, মাধুরী না মানসী ?), কিন্তু পরিস্থিতিগুলি জুড়ে জুড়ে তো চরিত্র রচিত হয় না। আমরা জানি না, মাধুরী-মানসীর অসীম ব্যতিরেকে সম্পর্ক কী,

পরস্পরকে তারা বোঝে কি না, বোঝার মতো কিছু আছে কি না। মাধুরীর বিয়ের ইচ্ছে আছে বোঝা যায়, রূপ আছে, বিয়ে না হবারও কিছু নেই, অসীমকে তার ভালো লাগাটা সত্যি ভালোবাসা কি না, মানসীর রূপ-বিনয়-লাবণ্যের অভাব থাকলেও অসীম আছে তার, তাহলে সমস্যাটা কোথায়—এ সমস্ত কিছুই এ উপন্যাসে স্পষ্ট নয়। মনোমোহনবাবুর পরিবারে বাস্তবিক কোথাও সমস্যা নেই। ঘুম হয় না ভদ্রলোকের, তাই বকেন রাত জেগে। সে বকুনি থেকে কোনো বড় সমস্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। ছেলে বিয়ে করে স্বতন্ত্র দাম্পত্যজীবন যাপন করতে গেছে, কিংবা মেজ মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না, ছেলে ফেল করেছে, মেয়ে প্রেম করছে—এগুলো শতকরা নব্বইটা মধ্যবিত্ত পরিবারের অবশ্য-বহনীয় ঝামেলা মাত্র। এর মধ্যে একটা উপন্যাসের উপযুক্ত প্রসঙ্গ কোথায়? কাজেই এটা একটা পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝির গল্প। বোনেদের মধ্যে কিছু মান-অভিমানের পালা, শেষ পর্যন্ত বড় বোনের প্রত্যাশিত উদারতায় যার অশ্রু-স্নিগ্ধ উপসংহার। অথচ তিন দিন তিন রাত্রির পরিবেশে সম্ভাবনা ছিল অনেক। অনেকেরই অনেক কিছু হতে চাওয়া, এবং না হতে পাওয়া ছড়িয়ে রয়েছে এই উপন্যাসে। কিন্তু তারা মূলতঃ রইল অব্যবহৃত। প্রতি মুহূর্তের সেই চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্ব এখানে জীবনের সুনির্দিষ্ট পটে সুলগ্ন থেকে, অথবা তাকে দীর্ণ করতে চেয়ে, ভাবনা-চঞ্চল নয়; অথচ সমস্যাসঙ্কুল ব্যক্তিত্বের চেহারাগুলিও প্রতিকূল পরিবেশে আত্মনিরীক্ষায় স্পষ্ট-রেখ হয়ে উঠল না।

গদ্যভঙ্গিমার ঔজ্জ্বল্য নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্যতম সম্পদ। তিনি বেশ ভালো করে বলতে জানেন। কম বলে অনেক বলার ব্যঞ্জনা আনতে পারেন। কিন্তু প্রসঙ্গজনিত দুর্বলতার যে ছাপ এই উপন্যাসে, তাকে গদ্যভঙ্গিমা দিয়ে দৃঢ় করা যায় না। মুগ্ধতার আবরণ সৃষ্টি করে উদ্দেশ্য সাধন করার অযৌক্তিক মনোভাব থেকেই জন্মলাভ করেছে—"পাতার আড়ালে বাসা। বাসার আড়ালে বাসনা।" অথবা "মন তখন তন্ময়, মানে তনুময়।" অথবা "বাক্য আর চুম্বনের অফুরন্ত সম্পদ অধর ছাড়া আর কিসে ধরে"—প্রভৃতি বাগবৈদগ্ধ্যের অকারণ ফুলঝুরি।

এক কথায় এ গল্প মাধুরীর গল্প। এবং মাধুরীর অভিজ্ঞতাও খুব বড় অভিজ্ঞতা নয়। অসীম এবং মানসী ব্যক্তিবিশেষ হয়ে উঠতে পারে নি। কাজেই সুলিখিত একখানি গল্প ছাড়া এক্ষেত্রে নরেনবাবুর দেয় কিছু ছিল না। গদ্য-ভঙ্গিমা উপন্যাস-ব্যতিরিক্ত কিছু নয়, সারল্য মানে নয় বক্তব্যের অভাব—'রস' এবং 'চেনামহল'-এর লেখককে যখন একথা মনে করিয়ে দিতে হয়; তখন সেটা সমালোচকেরও দুর্ভাগ্য।

এই দশকে লেখা কয়েকটি গল্প

অমল দাশগুপ্ত

সাম্প্রতিক কালের কয়েকজন তরুণ লেখকের হাতে বাংলা ছোটগল্প নতুন চেহারা নিয়েছে, যার নাম শোনা যাচ্ছে নতুন রীতির ছোটগল্প। এই নতুন রীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সাতচল্লিশ-পরবর্তী কালের নতুন বাস্তবতাকে প্রকাশ করার তাগিদেই এর উদ্ভব। এই রীতিতে গল্প শুধুই গল্প নয়, এমনকি হয়তো গল্প একেবারেই নয়। সেখানে মানুষের চিন্তাপ্রবাহকে এমনভাবে তুলে ধরা হবে, তার অন্তর্লোকের ঘাত-প্রতিঘাতকে এমন ভাবে উদ্‌ঘাটিত করা হবে, তার চলাফেরা ও আচার-আচরণের এমন একটি তাৎক্ষণিক পটভূমি রচনা করা হবে যার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠবে সেই মানুষটির সম্যক পরিচয়। এমনকি এই দাবিও তোলা হয়েছে যে সাতচল্লিশ-পরবর্তী কালের নতুন বাস্তবতাকে প্রকাশ করার এই হচ্ছে রীতি।

এই ভূমিকাটুকুর এজন্যে দরকার ছিল যে সম্প্রতি একটি গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে যাতে দেখা যাচ্ছে এই নতুন রীতির লেখকরাই অন্তর্ভুক্ত। বইটির নাম 'এই দশকের গল্প'*। সম্পাদক, বিমল কর। প্রকাশকের ঘোষণায় বলা হয়েছে—"সাম্প্রতিক কালের ষোলজন তরুণ লেখককে নিয়ে এই গ্রন্থ। যাঁরা সকলেই প্রায় এই দশকের মধ্য সময় থেকে লিখতে শুরু করেছেন। অতি স্বল্প সময়ে এঁদের সাহিত্য প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করে বহু বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তাই আঙ্গিক রীতি বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতর স্বাদের জন্য এই সংকলন অবশ্যই গল্প-পাঠকের কাছে প্রিয় হবে।" এই ঘোষণায় বা সম্পাদকের ভূমিকাতে কোথাও 'নতুন রীতি' কথাটি ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু এই সংকলনের অন্তত তিনজন লেখক 'ছোটগল্প—নতুন রীতি' পত্রিকায় গল্প লিখেছেন। অন্যান্যরাও বিভিন্ন আলোচনায় এই রীতির লেখক হিসেবেই উল্লিখিত। কাজেই এই সংকলনটিকে নতুন রীতির

* এই দশকের গল্প। বিমল কর সম্পাদিত। পলাশী। চার টাকা।

ছোটগল্পের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরে নিলে অন্যায় করা হবে না। যদিও সম্পাদক বিমল কর ভূমিকায় বলেছেন—"'এই দশকের গল্প' প্রধানত তাঁদেরই গল্পের সংকলন, যাঁদের রচনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমি গত অর্ধদশক মোটামুটি পরিচিত। আমার সঙ্কীর্ণ পরিচয়ের বাইরে অনেক তরুণ লেখক আছেন, হয়ত তাঁদের মধ্যে সুলেখকেরও অভাব নেই—তথাপি এই ক্ষুদ্রায়তন সংকলনে তাঁদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করতে না পারার ত্রুটি দুর্ভাগ্যবশতই আমার।" এই অত্যন্ত বিনীত ত্রুটি-স্বীকারের মধ্যেও এই ঘোষণাটুকু পরোক্ষে থেকে যাচ্ছে যে গত অর্ধদশকের মোটামুটি উল্লেখযোগ্য নতুন-রীতির গল্পলেখকরা এই সংকলনে উপস্থিত আছেন।

এতদিন পর্যন্ত নতুন রীতির গল্পের সন্ধানে নানা পত্রপত্রিকা হাতড়াতে হত। বিমল করকে ধন্যবাদ যে তিনি ষোলজন নতুন রীতির গল্পলেখককে একই মলাটের মধ্যে গ্রথিত করেছেন। অবশ্য তাঁর ভূমিকাটি যদি বিস্তৃততর হত এবং ভূমিকায় যদি তিনি এক-একজন লেখক সম্পর্কে এক এক লাইনে মন্তব্য না করে প্রত্যেকটি লেখা সম্পর্কে আলোচনা তুলতেন এবং বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্যকে এই নতুন ধারার গল্প কি-ভাবে অনুসরণ করছে সে-সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতেন তাহলে বোধ করি সম্পাদকের দায়িত্ব আরো সুষ্ঠুভাবে পালন করা হত। তাঁর ভূমিকাটি প্রায় অনেকটা প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তির মতো, বিশেষত যখন তিনি বলেন "ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস, গত পাঁচ বছরের বাংলা ছোটগল্পে যে ক'টি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়েছে, এই গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই সেই সংযোজনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।" এ-ধরনের উক্তিকে শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জোরে পাঠকের ওপরে চাপাতে গেলে সম্পাদককে ছাপিয়ে প্রকাশকের গলাই জাহির হয়ে পড়ে এবং ফলে পাঠকের কাছে তার কোনো গুরুত্ব থাকে না।

অবশ্য এক হিসেবে এতে ভালোই হয়েছে। আরো ভালো হয়েছে গল্পগুলোকে লেখকদের নামের আদ্যাক্ষরের অনুক্রমে সাজিয়ে। গল্পগুলো পাঠ করার সময়ে পাঠকদের মনে কোনো পূর্বকৃত ধারণা প্রশ্রয় পাবে না।

আমি কিন্তু নতুন রীতির গল্প সম্পর্কে বিশেষ কতকগুলো ধারণা নিয়েই এই বইটি পড়েছি। এবং স্বীকার করতে বাধা নেই, বইটি পড়ার পরে আমার সমস্ত ধারণা লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে। কেন, তা বলা দরকার। যে ষোলটি গল্প এই সংকলনে ছাপা হয়েছে তার যে-কোনো একটিকে নতুন রীতির গল্প

বলে গ্রহণ করলে অন্য পনেরোটিকেই নতুন রীতির গল্প নয় বলে বাতিল করতে হয়। সম্পাদকের ভূমিকা থেকে জানা গিয়েছে যে তিনি এই সংকলনের জন্যে লেখা বাছাই করেন নি, বাছাই করেছেন লেখক। এবং তাঁর ধারণা—"এই গ্রন্থের প্রতিটি গল্পই লেখকদের নিজস্ব শিল্প স্বভাব এবং কর্মের প্রতিনিধিত্ব করছে," ইত্যাদি। অর্থাৎ, সম্পাদকের কাছে এই ষোলজন লেখকই তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশেষত্ব মণ্ডিত। অথচ পাঠক হিসেবে দেখতে পাচ্ছি, এই ষোলজন লেখকের মধ্যে একমাত্র মিল এই যে এঁরা গত অর্ধদশকের মধ্যে লিখতে শুরু করেছেন। অর্থাৎ কথাটা দাঁড়াচ্ছে যেন এই যে নতুন রীতির গল্পলেখক বলে যাঁরা পরিচিত তাঁদের সাহিত্যপ্রচেষ্টায় মিল লক্ষণগত নয়, কালগত। নইলে এই সংকলনে "সাবেকী" রীতিতে লেখা অতি-সরল ও অতি প্রকট রকমের উদ্দেশ্য-প্রবণ 'ফানুস' গল্পটি কি-ভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে জানি না।

নতুন রীতির গল্পলেখকরা তাঁদের রীতি সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে যা-কিছু বলেছেন তার সঙ্গে লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে বাছাই করতে হলে এই সংকলনের একটিমাত্র গল্পই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। সেটি হচ্ছে দেবেশ রায়ের 'দুপুর'। এই গল্পটিতে কোনো কাহিনী নেই। আছে একটি দুপুর আর যতীনবাবু নামে চল্লিশোত্তর এক ভদ্রলোকের পুরো একটি সংসার। আর আছে দু-আনার ব্যাঙ বেহালার ধ্বনি। গল্পের পাঁচজন মানুষের চিন্তাভাবনায় এই দুপুর পাঁচটি বিচিত্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে আর ব্যাঙ বেহালার সুরে মূর্ত হয়ে উঠছে পাঁচজন মানুষের অনেক চাওয়া ও যন্ত্রণা। যতক্ষণ এই দুপুর আর যতক্ষণ এই বেহালার সুর—ততক্ষণই এই পাঁচজন মানুষ আশ্চর্য এক ভাবনাবৃত্তে দোলায়িত হতে থাকে। এই দুপুর আর এই বেহালার সুর যেন মধ্যবিত্ত জীবনের অচরিতার্থ আশা ও অপূর্ণ কামনার প্রতীক। আর এই কারণেই "মাটির বেহালাটা নিজের ছোট দেহটাতে পাগলের মতো ঝড়ো সুরের আওয়াজ এনে বিদীর্ণ হয়ে, থেমে যাবার আয়োজন করছে যেন। ঝড়ের সঙ্গে লড়ছে যেন চড়ুই পাখি। হঠাৎ একটা ট্রামের জান্তব আওয়াজে মাটির বেহালার সুরটা নেমে গেল।" আর তখন পাঁচজনেরই মনে হতে লাগল, "বাড়ির কোনো এক খ্যাপা সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে, প্রতিদিনই তার আসার আশা, কোনোদিনই সে ফেরে না।" তারপরেই দুপুরটা ধীরে ধীরে বিকেল হয়ে যায়।

এই গল্পটিকে যদি নতুন রীতির দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যায় তাহলে নতুন রীত
সম্পর্কে আস্থাশীল হওয়া চলে। গল্পে কোনো কাহিনী নেই, কোন
সাস্‌পেন্‌স্‌ বা সারপ্রাইজ বা সিচুয়েশন নেই, এমনকি বলতে গেলে চিরাচরি
ধরনের আরম্ভও নেই বা শেষও নেই। শুধু পরিবেশ-রচনা ও চিন্তাপ্রবাহে
মাধ্যমে যে এমন একটি বাস্তবকে এমনভাবে পরিস্ফুট করা চলে, তা এই গল্প
না পড়লে বোঝা যাবে না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি আশঙ্কার কথাও ব্যক্ত করতে হয়। পাঠক হিসে
যতদূর কল্পনা করতে পারি, এ-ধরনের গল্পকে গল্পের নিজস্ব পরিমণ্ড
তৈরির জন্যেই খুব সম্ভবত মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী হতে হবে। অন্তত দেবে
রায়ের যে-ক'টি গল্প আমি পড়েছি তাতে এর ব্যতিক্রম নেই। আর মধ্যবি
জীবনাশ্রয়ী গল্প অনিবার্যভাবেই গল্পের পরিসরকে সংকীর্ণ করে তোলে এব
শেষ পর্যন্ত হয়তো বা সব গল্পকেই একই গল্পের পুনরাবৃত্তি বলে মনে হ
থাকে। প্রবাহমান জীবনকে, যে-জীবন রাজপথের মিছিলে সামিল হয়
ময়দানে দাঁড়িয়ে লড়াই করে, তার প্রচণ্ডতা ও অমিতবিক্রমকে এ ধরনে
গল্পে আনা যাবে কিনা তা এখনো দৃষ্টান্তসাপেক্ষ। হতাশা, ব্যর্থতা, ক্লীব
বা এ-ধরনের নঙর্থক দিকগুলোই যেন এ-ধরনের গল্পের মেজাজের সঙ্গে খা
খায় ভালো। কলকাতার গত খাদ্য-আন্দোলন নিয়ে লেখা দু-একটি নতু
রীতির গল্প পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কোনো গল্পেই খাদ্য-আন্দোলনে
সেই বজ্র-নির্ঘোষ নেই। সেখানে অনেক মাজাঘষা করে ও পালিশ দি
শেষ পর্যন্ত যে মিনমিনে আওয়াজটুকু বার করা হয়েছে তা শোনার পরে খাদ্য
আন্দোলনের শহিদদের জীবনদান অকারণ বলে মনে হয়।

এমনকি দেবেশ রায়ের মতো লেখকও 'দুপুর'-এর মতো গল্প সম্ভবত এ
একটিই লিখেছেন। পরবর্তী কালের লেখা তাঁর যে-কটি গল্প আমি পড়ে
তার কোনোটিই 'দুপুর'-এর শিখর স্পর্শ করতে পারে নি। খুব সম্ভবত
সম্ভবও নয়। এ-ধরনের গল্প কয়েকটি লেখা হবার পরেই লেখকের আর নতু
করে কিছু বলার থাকে না। আর সাতচল্লিশ-পরবর্তী কালের বাস্তবতা
প্রকাশ করার প্রকরণকে যাঁরা আয়ত্ত করেছেন বলে দাবি করেন তাঁদে
নিশ্চয়ই চাষীমজুরের জীবন নিয়েও কিছু লিখতে হবে। নতুন রীতি
চাষীমজুরের জীবন নিয়ে গল্প রচনা সম্ভব কিনা তা এখনো দৃষ্টান্তসাপেক্ষ।

একটু আগে যে বজ্রনির্ঘোষের কথা বলেছি তাকে যদি আক্ষরিক অ

ধরতে হয় তাহলে গল্পের যে কি পরিমাণ দুর্দশা ঘটে তার একটি দৃষ্টান্তও এই সংকলনে আছে। অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'কোনো এক লেখক বন্ধুকে'। রীতির দিক থেকে এই গল্পটিতে নতুন কিছু আছে কিনা আমি ধরতে পারিনি। উত্তমপুরুষে পত্রাকারে লেখা এই গল্পটিতে পুরোপুরি একটি গল্পই বলা হয়েছে। কিন্তু তাকে ঠেসে দেওয়া হয়েছে অগ্নিবর্ষী একটি বক্তৃতার মধ্যে। গল্পটি পড়তে পড়তে মনে হয় যে লেখক আশঙ্কা করছেন, পাঠক তাঁর গল্পের সম্পূর্ণ তাৎপর্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না। ফলে গল্পের প্রতি লাইনের পরে তাঁকে প্রচণ্ড স্বরে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে। অমলেন্দু চক্রবর্তীর সত্যিকারের ভালো গল্প আমি পড়েছি বলেই দুঃখের সঙ্গে এই কথাগুলো লিখতে হল। জানি না এই অতি-সরব হুংকার নতুন রীতির কোনো লক্ষণ কিনা। তা যদি হয়ে থাকে তবে এই রীতি তিনি যত তাড়াতাড়ি পরিত্যাগ করবেন ততই মঙ্গল।

আরো একজন শক্তিমান লেখকের ক্ষেত্রে এই নতুন রীতি দুর্লক্ষণ হিসেবে দেখা দিয়েছে বলে আমার ধারণা। তিনি হচ্ছেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সংকলনে তাঁর যে গল্পটি ছাপা হয়েছে সেটির নাম 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। এ-যুগের একজন তরুণ ও একজন তরুণীর গল্প। এক বছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু কলকাতার উর্ধ্বশ্বাস ও রুদ্ধশ্বাস জীবন তাদের বিবাহিত জীবন-যাপনের সুযোগটুকুও দেয়নি। এই গল্পে পুরোপুরি একটি গল্প আছে, তার শুরু আছে বিস্তার আছে শেষ আছে, এমনকি শেষের দিকে অপ্রত্যাশিত একটি চমক পর্যন্ত আছে। অর্থাৎ গড়নের দিক থেকে পুরোপুরি "সাবেকী"। আর যদি পরিবেশনের দিক থেকেও তাই হত তবে এটি অনায়াসেই একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হতে পারত। কিন্তু এই গল্পটিতে এমন কয়েকটি নতুন-রীতি-সুলভ টুইস্ট আছে যেখানে পাঠককে হোঁচট খেতে হবে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

" 'আচ্ছা, আমি যদি চিৎকার করে লোক জমিয়ে বলি, এই যে দেখছেন ভদ্রমহিলা—ইনি আমার ধর্মপত্নী, তাহলে ?'

'পাগল বলে ধরে নিয়ে যাবে, এই আর কি।'

'তাহলে তো বেঁচে যাই।' কাঞ্চন হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারল না। রেখা ঠোঁট চেপে প্রশ্ন করল, 'আহা, অ্যাজমাটা আবার মাথাচাড়া দিল ?' কাঞ্চন বলল, 'জান, এই কথার খেলা সত্যি আর ভাল লাগে না।' রেখা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো।"

রেখা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো! এই ছোট্ট লাইনটির মধ্যে কাঞ্চন ও রেখার বঞ্চিত জীবনের যন্ত্রণাকে যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। এবং লেখক যদি এখানেই থামতেন তাহলে বোধ হয় ভালো হত।

কিন্তু তারপরেই আছে কাঞ্চনের বিপুল এক চিন্তাপ্রবাহ। এই চিন্তাপ্রবাহে সমাজ সংসার ও পৃথিবী সম্পর্কে প্রাজ্ঞ মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারপরে শেষদিকে—"এ-যুগের নিয়তিই হল বাল্য এবং প্রৌঢ়তা—মধ্যিখানে বিশাল চড়ায় ইচ্ছা ও অভিজ্ঞতা, ভাললাগা ও কর্তব্যের বিরোধে আমরা পোকার মতো গর্ত খুঁড়ে নিচে নামছি—অথচ সামনে সমুদ্র ছিল। হায় রে সমুদ্র। নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছি কথায়, রেখাকে ফাঁকি দিচ্ছি কথায়। আর পুঁথি থেকে তার সমর্থন খুঁজছি। আহ্, ফুলগুলি যেন আর পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার পুঞ্জিত নীরবতা। পুঞ্জিত, নীরবতা, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য। ফুটুক না ফুটুক। বসন্ত। আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে। এই নিরালায়। আমার বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকানো আছে। দিনে দিনে অর্ঘ্য মম। দিনে দিনে রূপবতী হবে পৃথিবী। দিনে দিনে, দিনের পর রাত্রি। কিন্তু রাত্রির পর? রাত্রির পর?"

এই কথার পিঠে কথা সাজিয়ে যাওয়া আর টুকরো টুকরো কবিতার লাইন—এসব কেন? গল্পের পক্ষে এই লাইনগুলো কি অপরিহার্য? বরং আমার তো মনে হয়, গল্পের ঘটনার মধ্যে দিয়ে কাঞ্চনের মানসিক যন্ত্রণার যে রূপটি ফুটে উঠেছে এবং তার ফলে পাঠকের সংবেদনশীলতায় যে সুরটি বেজে উঠেছে, এই লাইনগুলো সেখানে স্থূল হস্তক্ষেপ। অমলেন্দু চক্রবর্তী যেমন ভাবছেন যে বক্তৃতা দিয়ে পাঠকের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলবেন, দীপেন্দ্রনাথ তেমনি ভাবছেন যে কথার ফুলঝুরি দিয়ে পাঠকের কল্পনাকে দেদীপ্যমান করে তুলবেন। আসলে দুজনে যা করছেন তার ফলে পাঠকের সামনে অবরোধের প্রাচীর উঠছে মাত্র।

অথচ দীপেন্দ্রনাথের গল্পে এই কথার খেলাটুকুই নতুনত্ব। নইলে যে গল্পটি তিনি বলেছেন এবং যে-ভাবে বলেছেন, তা "সাবেকী" রীতির অনুসারী। এবং আমার নিজের ধারণা, পুরোপুরি একটি "সাবেকী" গল্প হলেই বোধ হয় গল্পটি দাঁড়াত।

আরো একটি খুব মোটা কথা আছে। এ-যুগের একটি তরুণ বিয়ের এক বছরের মধ্যেও বৌয়ের হাতে একবারটিও হাত রাখেনি, অথচ প্রায়ই

তারা একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে—এর ফলে ঘটনাটি যত না ট্র্যাজিক হয়ে উঠেছে তার চেয়েও বেশি লজ্জাকর। অন্তত দীপেন্দ্রনাথ এই গল্পে কাঞ্চনের জন্যে এমন একটুখানি শক্ত মাটি রাখেন নি যেখানে দাঁড়িয়ে সে এই তারুণ্যের লজ্জা থেকে বাঁচতে পারত।

আরো একটি কথা আছে। দীপেন্দ্রনাথের এই গল্পটি এবং অন্যান্য অনেক গল্পই একটিমাত্র চরিত্রের চোখ দিয়ে দেখা। উত্তম পুরুষে গল্প লেখার যেমন একটি সীমাবদ্ধতা আছে—এক্ষেত্রেও তাই। গল্প সাবজেক্টিভ হয়ে ওঠে। এই গল্পে কাঞ্চনের জায়গায় আমি এলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। চর্যাপদের হরিণীর অধিকাংশ গল্প সম্পর্কেও এই একই কথা। খুব সম্ভবত এই কারণেই উত্তমপুরুষে লেখা গল্পের মতো এসব গল্পেও লেখক নিজে কখনো প্রচ্ছন্ন থাকতে পারেন নি।

মতি নন্দী ও বরেন গঙ্গোপাধ্যায়কে নতুন রীতির লেখক কেন বলা হয় আমি জানি না। এই সংকলনে মতি নন্দীর 'চোরা ঢেউ' ও বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তোপ' গল্প দুটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমার তো মনে হয়, এই গল্প দুটি নতুন রীতির মূর্তিমান প্রতিবাদ। দুটি গল্পই চিত্রধর্মী, দুটি গল্পেই বিশেষ এক-একটি পরিবেশে একদল মানুষকে দেখানো হয়েছে। পুরোপুরি রক্তমাংসের মানুষ এবং সেই কারণেই তাজা ও সজীব। আর গল্প লেখার যে-ভঙ্গি আয়ত্তে থাকলে পাঠককে আচ্ছন্ন করা যায়—এই দুজন লেখকই তা আয়ত্ত করেছেন বলে মনে হয়, কারণ এই গল্প দুটি পড়ার সময়ে গল্পের রীতি নিয়ে মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না। তবে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে তোপটি যদি আরেকটু সজীব হত তাহলে এই গল্পটি একটি স্মরণীয় গল্প হতে পারত বলে আমার ধারণা। মতি নন্দী সম্পর্কেও একটি বলার কথা আছে। পরবর্তীকালে তাঁর আরও গল্প আমি পড়েছি। আমার মনে হয়, তাঁর সম্পর্কে এই আশঙ্কার কারণ ঘটেছে যে তিনি এই চোরা ঢেউতেই আটকা পড়ে গিয়েছেন। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিসরে তাঁর চলাফেরা। আরো ভালো গল্প লিখতে হলে তাঁকে এই সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

এই সংকলনের তরুণতম লেখক দিব্যেন্দু পালিত। কিন্তু 'দুঃসময়' নামে তাঁর যে গল্পটি পাওয়া যাচ্ছে তাতে অল্প বয়েসের ছাপ নেই। এমনি আরেকটি পরিণত গল্প শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'আমার মেয়ের পুতুল'। এই দুজন লেখকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থাশীল হওয়া চলে।

সোমনাথ ভট্টাচার্যের 'হাউই' গল্পটি পড়ে বোঝা যায় যে এই গল্পের লেখক ক্ষমতাবান। পরিবেশ রচনার দিকে তিনি খুবই মনোযোগী এবং গল্পের বক্তব্যকে খুবই স্পষ্টভাবে উপস্থিত করতে পারেন। এঁকে নতুন রীতির লেখক বলা হয় কিনা আমি জানি না। অন্তত 'হাউই' গল্পে নতুন রীতির কোনো ছাপ নেই। এঁর সম্পর্কেও আমরা আশা পোষণ করতে পারি।

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য নানা পত্রপত্রিকার নিয়মিত লেখক। এই সংকলনে তাঁর 'প্ল্যাটফর্মের গল্প' পাওয়া যাচ্ছে। এই গল্পটিতে নতুন রীতি কিছু আছে কিনা আমি বুঝতে পারিনি। তবে উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে লেখা এই গল্পটিতে কোনো নতুনত্ব নেই। যশোদাজীবন ভট্টাচার্যের লেখা আরো ভালো গল্প আমি পড়েছি।

বরং রতন ভট্টাচার্যের 'পিঞ্জর' গল্পটি উদ্বাস্তু-জীবনের এক গভীর ক্ষতমুখের দিকে আরো স্পষ্টভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। অবশ্য গল্পটি পড়ে মনে হয়, লেখকের দৃষ্টি যেন একটি আতসকাচের মধ্যে দিয়ে তার চরিত্রের ওপরে গিয়ে পড়েছে। ফলে চরিত্রের বিশেষ একটি মানসিকতা এত মস্ত হয়ে ফুটে উঠেছে যে অন্য সমস্ত কিছু ছাপিয়ে সেইটুকুই প্রধান। তবুও দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্বের জন্যে এই লেখক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।

প্রবোধবন্ধু অধিকারীর 'নকল নক্ষত্র' গল্পটি একটি দুরূহ প্রচেষ্টা। এই গল্পে একই মানুষের দুই সত্তাকে হাজির করে মানবিক সম্পর্কের কয়েকটি মৌলিক ধারণাকে যাচাই করার চেষ্টা হয়েছে। লেখকের একটি স্পষ্ট বক্তব্যও আছে। গল্পটি সম্ভবত নতুন রীতির—একপাশের আমির সঙ্গে অন্যপাশের আমির পরিচয়। কিন্তু লেখকের দৃষ্টি চরিত্রের যতখানি গভীরে পৌছতে পারলে এ-ধরনের পরিচয় সার্থক হয়ে উঠতে পারে এ-গল্পে তার অভাব আছে। তবে লেখকের বয়স খুবই কম এবং এ-গল্পে তিনি যতখানি কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাতে আশা করা চলে যে ভবিষ্যতে তিনি সার্থক পরিণতি অর্জন করতে পারবেন।

এই সংকলনে আরো কয়েকটি গল্প আছে যে-সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করাটা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে বলে মনে হচ্ছে। খোলাখুলি স্বীকার করছি, আমি ভালো বুঝতে পারি নি। যোগ্যতর কোনো সমালোচক এ-দায়িত্ব পালন করবেন আশা করি।

স্তালিনের পরে

ননী ভৌমিক

শ্রীযুক্ত বোফ্‌ফা ইতালির নামকরা কমিউনিস্ট দৈনিকপত্র 'উনিতা'র বৈদেশিক সম্পাদক। ১৯৫৩ সাল থেকে পাঁচ বছর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে কাটিয়ে গেছেন উনিতার মস্কো সংবাদদাতা হিসেবে। স্তালিনের মৃত্যুর ঠিক পরেকার সেই কটা বছর তাঁর চোখে দেখা—যা নিয়ে অমন ভাবনা, পুনর্ভাবনা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিহ্বলতাও দেখা দিয়েছিল বিশ্বের সোভিয়েত জিজ্ঞাসুদের মনে। কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসের একটা দূরাগত সোরগোল পটচ্ছিন্ন সংবাদের অসংলগ্নতায় এবং ওদেশটা সম্পর্কে ধারাবাহিক অপরিচয়ের কুয়াশায় যে না-বোঝার—এমনকি ভুল বোঝার সৃষ্টি করেছিল, সেটা আজ চারবছর পরে স্তিমিত বোধ হলেও, মনে হয় না কেটেছে। সকলেই এটুকু জেনেছেন যে একটা মোড় নিয়েছে ওরা। কিন্তু সেটা ঠিক কী, কেন, এবং কোন্‌দিকে—তার খবর নয় বোধ—এটা সুলভ নয়। থেকে থেকে দয়েৎসারের কাগুজে হুজুগে রোমাঞ্চিত হয়ে যাঁরা অনেক ঠকেছেন তাঁদের কাছে তাই বোফ্‌ফার বইটি* ভারী মূল্যবান মনে হবে। আমার কাছে তো আরো বেশি, কারণ বোফ্‌ফা যেখানে শেষ করেছেন, সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা প্রায় সেখান থেকে শুরু। এবং আমার নিজের মনে পরের কয় বছরে যে দাগটা পড়েছিল, সানন্দে দেখা গেল সেটা মূলত বোফ্‌ফার কার্ডের সঙ্গে মিলতে বাধা পাচ্ছে না। যাঁরা বেছে বই পড়তে চান তাঁদের জন্য প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি এঁকে ভরসা করা চলে। মস্কোর বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে এঁর মতো এত ঘুরেছেন, এত দেখেছেন সম্ভবত আর কেউ না। নিজের সাক্ষ্যে জানি, শুধু বিদেশী সাংবাদিক মহলে নয়, ওপক্ষের মহলে অর্থাৎ রাশিয়ার সরকারী প্রেস ডিপার্টমেন্টেও এঁর সত্যবাদিতা কতটা শ্রদ্ধেয় ছিল।

কিন্তু তার মানে অবশ্যই এই নয় যে বোফ্‌ফার সব উক্তি সমান গ্রাহ্য।

* Guiseppe Boffa: **Inside the Khrushev Era.** George Allen & Unwin. 25 sh.

কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সে দাবি করা সম্ভব নয় এবং বোফ্‌ফা নিজেও তা জানেন। জানেন বলেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের পালটা ধারণা পেশ করলেও তা নিয়ে কালক্ষেপ করেন নি, সেটাকেই বক্তব্য করে তুলতে চান নি। বরং তাঁর নিজস্ব মন্তব্যটাকে প্রতিক্ষেত্রে একটা মুক্ত প্রশ্ন হিসাবে ছেড়ে দিয়ে তিনি সব জোর দিয়েছেন সেই সব মূল কথাগুলোকেই খোলসা করতে, যাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি একমত। যেমন গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে সোভিয়েত নির্বাচনপদ্ধতির কথায় এসে তাঁর ঝোঁক হয়েছে এই প্রশ্ন তোলার, সোভিয়েত ইউনিয়নে একক প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতির এখনো কি দরকার আছে? তাঁর ধারণা এমন নির্বাচনপদ্ধতি সম্ভব যাতে গণতন্ত্র আরো বিকশিত হতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ উত্তর দিতে ভোলেন নি যে সে পদ্ধতি ঠিক কী হবে, আরো বেশি সংখ্যক নামের সুপারিশ, তল থেকে প্রার্থীদের আরো খুঁটিয়ে বিচার ইত্যাদি, তা "only the Soviets can decide." এবং সত্যিই তারা decide করছে। সম্প্রতি প্রাভদায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির যে খসড়া কর্মসূচি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আরো নানা কথার মধ্যে অতি স্পষ্ট করে এই নির্বাচনপদ্ধতির কথাটিও তোলা হয়েছে। কর্মসূচির তৃতীয় ভাগ 'রাষ্ট্র কাঠামো ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অধিকতর বিকাশের ক্ষেত্রে' প্রথম অংশ 'সোভিয়েতসমূহ এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতির বৃদ্ধি' শিরোনামায় পড়া গেল: "জনপ্রতিনিধিত্বের রূপ (forms) নিখুঁত করা ও সোভিয়েত নির্বাচন পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক নীতি বাড়িয়ে তোলা অপরিহার্য বলে পার্টি গণ্য করছে।" কী ভাবে? নির্বাচনের আগে সংবাদপত্রে এবং নির্বাচকদের সভায় প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ও অন্যান্য গুণাবলীর বিচার ও সমালোচনাকে আরো ব্যাপক ও সর্বদিকব্যাপী করে। দ্বিতীয়ত প্রতি নির্বাচনের সময় পূর্বতন সোভিয়েত সভ্যদের অন্তত এক তৃতীয়াংশের জায়গায় নতুন লোক এনে। অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত একক প্রার্থী পদ্ধতি বদলের কথা ওরা ভাবছে না।

অর্থাৎ খুঁটিনাটিতে বিকাশটা বোধহয় হুবহু ঠিক তেমন নয় যা হলে বোফ্‌ফা পুরোপুরি খুশি হতেন, কিন্তু মূল ব্যাপারে বিকাশটা অবশ্যই হুবহু ঠিক সেই পথেই, যা চার বছর আগের অভিজ্ঞতায় বোফ্‌ফা গভীরভাবে আশা করেছিলেন।

একক প্রার্থী পদ্ধতির কথা বোফ্‌ফা তুলেছিলেন প্রসঙ্গত, কিন্তু ইংরেজ

প্রকাশকরা বইয়ের জ্যাকেটে তার বিশেষ উল্লেখ করেছেন স্বধর্মেই, কারণ বহুকাল যাবৎ সোভিয়েত গণতন্ত্রকে এই বলেই আক্রমণ করা হয়ে এসেছে ও হচ্ছে যে সেখানে অন্য দেশের মতো দু-তিনটি নয়, নির্বাচনে মাত্র একটিই প্রার্থী দাঁড়ায়। স্বভাবতই এ প্রশ্নের আলোচনা একটি পৃথক প্রবন্ধের অপেক্ষা রাখে। ইতিমধ্যে শুধু এইটুকু বলে রাখা যেতে পারে যে নির্বাচনের যে শেষ ধাপটায় আমরা একক প্রার্থীকে দেখি, সেটা শেষ ধাপ মাত্র, আমাদের দেশের মতো একক এমনকি সর্বপ্রধান ধাপও সেটা নয়। আসলে ওদেশে নির্বাচনের মূল কাজটা হয়ে যায় প্রার্থী মনোনয়নের মাধ্যমে। একটা নির্বাচনী এলাকায় দাঁড়াবার জন্য বিভিন্ন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করে কোনো ব্যক্তি নয়—বিভিন্ন সংগঠন, যেমন ট্রেড ইউনিয়ন বা কারখানার সাধারণ সভা বা পার্টি কমিটি ইত্যাদি। প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার হয় সাধারণ সভায়। ছোট সভা, বড় সভা, প্রতিনিধিত্বমূলক সাধারণ সভা ইত্যাদিতে যোগ্যতা বিচার ও সমালোচনার পর একটি প্রার্থীর নাম রাখা হয়, যে সর্বোত্তম। তারপর ভোট গ্রহণের দিন যে ভোট নেওয়া হয় সেটা আসলে তখন আর নির্বাচন নয়, মূলত এক ধরনের রেফারেণ্ডাম—বিভিন্ন সাধারণ সভা থেকে শেষ পর্যন্ত যে একটি লোকের নাম বেরিয়ে এল তাকে অধিকাংশ লোক সমর্থন করছে কিনা তার যাচাই মাত্র। সকলেই জানেন শতকরা নিরানব্বুইয়েরও বেশি লোকে ভোট দিয়ে তাদের সমর্থন জানান, তাতে শুধু এই প্রমাণ হয় যে সাধারণ সভাগুলি, সংগঠনগুলি জনসাধারণ থেকে কত অবিচ্ছিন্ন; মাঝে মাঝে, কয়েক বছর আগে সত্যিই কোনো কোনো নির্বাচনে কোনো কোনো প্রার্থী শতকরা ন্যূনতম ভোট (শতকরা ৭০) পান নি। তাতে কী বোঝা গেল? বোঝা গেল একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ সভা ও সংগঠনগুলির প্রার্থী মনোনয়নে ভুল হয়েছে। বেশ কিছু লোক তা পছন্দ করছেন না। এসব কেন্দ্রে ফের নতুন করে নির্বাচন হয়েছিল। বলা বাহুল্য ও-পদ্ধতি স্বভাবতই গড়ে উঠেছে সেখানে, যেখানে একটির বেশি রাজনৈতিক দল নেই, এবং সোভিয়েত দেশে রাজনৈতিক দল শুধু যে একটি তার কারণ সে দেশের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিকাশ—অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলই আগে বা পরে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কার্যক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন হয়েছে; দ্বিতীয়ত তার সমাজ, কারণ বিভিন্ন দল থাকা সম্ভব শুধু পিছনে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকলে।

কিন্তু আগেই বলেছি, এ প্রশ্ন শুধু প্রসঙ্গত। বোফ্‌ফার বইয়ের প্রধান আকর্ষণ অন্যত্র—২০তম কংগ্রেসের মূল ধারাটিকে ঐতিহাসিকভাবে হাজির করায়, তার পৌর্বাপর্ব অনুধাবনে। সিধে কথায় তাকে বলা যেতে পারে স্তালিন-প্রসঙ্গ।

যুদ্ধের আগে থেকেই এবং বিশেষ করে যুদ্ধের পরে সোভিয়েত দেশে এমন কতকগুলি ব্যাপার দেখা যেতে থাকে যা সমর্থনযোগ্য নয়। তার মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো ঘটনা হল কারাবাস, নিপীড়ন, প্রাণদণ্ড, হঠাৎ এক-একজন লোকের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ও তার সম্পর্কে আর কিছুই না শোনা—পার্টি ও সরকারের উচ্চপদস্থ অনেকেই যার কবলিত হন। পরে প্রকাশ পেয়েছে কতকগুলি ক্ষেত্রে এ দণ্ডদান সঠিক হলেও অনেক ক্ষেত্রে বহু নিরপরাধ আত্মবলি দিতে বাধ্য হয়েছে। দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন কেননা অনাচারের যূপকাষ্ঠে উৎসর্গিত ও পরে সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কিছু বিখ্যাত নাম অনেকেরই জানা। বোফ্‌ফা নিজেও তাঁর পরিচিত দুয়েকজনের যে কাহিনী জানিয়েছেন তার দীর্ঘ অঙ্ক দুঃসহ নাটক আলোড়িত করার মতো। তার কারণ পীড়নের তীব্রতা ততটা নয়, যতটা এই নৈতিক জালা যে নির্যাতনটা শত্রুর কাছ থেকে নয়, এসেছে সমাদর্শীদের কাছ থেকেই। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনৈক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন বোফ্‌ফা। সে যুগে গ্রেপ্তারের পর ভাগ্য ক্রমে কয়েক সপ্তাহ বাদে তিনি ছাড়া পেয়ে পান। স্তালিন তাঁকে বলেন, "রাগ করবেন না, বিপ্লবী হিসাবে আমি জীবনে ছয়বার গ্রেপ্তার হয়েছি, কয়েদ খেটেছি।" ইনি উত্তর দিয়েছিলেন, "সে কথা সত্যি, কিন্তু আপনাকে গ্রেপ্তার করেছিল জারের পুলিস, সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমায় গ্রেপ্তার করে আমাদেরই রাষ্ট্র। বলবই যে সেটা একেবারে অন্য ব্যাপার।"

যুদ্ধের আগে থেকেই কিছুটা এবং বিশেষ করে যুদ্ধের পরেকার এই পীড়নাধিক্যের কথা শুনলেই ত্রৎস্কি বা কোয়েসলারকে মাফ করে দেবার প্রশ্ন আসে না। বরং স্তালিনের অন্যতম বৃহৎ কৃতিত্বই এই যে প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগ্রামে একান্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ত্রৎস্কির লেনিন-বিরোধী নীতি ও কার্যক্রমকে পরাস্ত করে সত্যিসত্যিই সমাজতন্ত্রের বনিয়াদকে পাকা করে দিয়েছেন তিনিই, তাঁর পরিচালনা। বুখারিনদের বিচারও অন্যায্য নয়, যদিও, বোফ্‌ফা বলছেন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগটায় কেউ গুরুত্ব

দেন না। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে বহু কৃতী সামরিক জেনারেল ও পার্টি কর্মীর উচ্ছেদ (যুদ্ধের প্রথম অবস্থার বিপর্যয়ের তা একটা কারণ), যুদ্ধের পরে ১৯৪৮ সালের পর থেকে ফের স্বৈরাচারী দমনের পর্ব—এগুলি ঘটনা, ও সমর্থনীয় নয়। প্রশ্ন উঠবে, কে দায়ী? অনেক ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষভাবে বেরিয়া দায়ী। কিন্তু শুধুই কি বেরিয়া? যে কথা ব্যক্তিগতভাবে কারো কারো মনে হলেও সচেতনভাবে কেউ ভাবতে সাহস করে নি, নির্যাতিত হয়েও বহুক্ষেত্রে একান্ত বিশ্বাসেই প্রতিকারের আবেদন গেছে যার কাছে, সেই স্তালিনের ভূমিকা বিচারে কিভাবে শেষ পর্যন্ত একটু একটু করে পৌছতে হয়েছে সোভিয়েত নেতা ও কর্মীদের। এবং বলতে হয়েছে, দায়ী ব্যক্তি-পূজা।

কিন্তু সমাজতন্ত্রে এমন ব্যাপার আদৌ ঘটতে পারল কী করে? এ প্রশ্ন না তুলে এগুনো যায় না। বোফ্‌ফা এক্ষেত্রে চীনা কমিউনিস্টদের দার্শনিক বিশ্লেষণের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা দেখান, সমাজে বিরোধ আছে দু-রকমের, একটা বৈর-বিরোধ, আর একটা জনগণের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ বিরোধ। বৈর-বিরোধ আপোসহীন—সাম্রাজ্যবাদকে, গৃহযুদ্ধকে, ফ্যাসিস্ট আক্রমণকে সোভিয়েত যেভাবে অতিক্রম করেছে সেটা বৈর-বিরোধ নিরসনের পথ। যতদিন সাম্রাজ্যবাদী আবেষ্টনী ও দেশের অভ্যন্তরে বৈরশ্রেণী বা অংশ বিশেষ বর্তমান, ততদিন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বৈর-বিরোধের আবির্ভাব হতে পারে ও তা নিঃসার্থে নির্মম দমনে মার্কসবাদীর আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে যখন বৈরশ্রেণীর অস্তিত্ব নেই, তখন জনগণের মধ্যেকার যে কোনো বিরোধকেই বৈর-বিরোধ নিরসনের পদ্ধতিতে সমাধান করতে যাওয়া ভুল। এই ভুল হয়েছিল স্তালিনের শেষদিককার আমলে, যে ভুলকে স্তালিন তত্ত্বে পরিণত করে বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রে শ্রেণীসংগ্রাম বাড়তেই থাকবে।

বোফ্‌ফা এই প্রসঙ্গে সোভিয়েতের ইতিহাস অনুসরণ করে দেখিয়েছেন, কীভাবে মূল গতি, মূল বিরোধের ক্ষেত্রে স্তালিন-পরিচালনায় পার্টি ও সোভিয়েত দেশ নির্ভুল লক্ষ্যে এগিয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয় অসম্ভব হত যে নিঃসন্দেহ বৈষয়িক ভিত্তি ছাড়া—তার নির্মাণে, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে, বৈজ্ঞানিক শক্তির সংহতি গঠনে সোভিয়েত দেশের কৃতিত্ব তর্কাতীত এবং তাতে স্তালিনের উজ্জ্বল ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় বিরোধের লক্ষণ আগাগোড়াই প্রকা পেয়ে এসেছে এবং তা নিরসনের স্তালিন পদ্ধতি প্রথম দিকে অনিবার্য ব মানলেও ক্রমেই ক্ষতিকর এবং পরিশেষে বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেয়। কত বিপজ্জনক, তা বোঝা গেছে গত যুদ্ধের প্রথম দিকটায়। যে পশ্চাৎপসরণ নেপলিয়ন-কালের কুতুজভী পদ্ধতি বলে একটা ব্যাখ্যা গড়ে নেওয়া হয়েছি সেটা যে আসলে কত এলোমেলো ও সর্বনাশা, তার উল্লেখ করে বোক বলেছেন, তবু যুদ্ধের মতো একটা ব্যাপারে বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ যৌথ প্রভাব অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল এবং স্তালিনের ভ্রান্তি থেকে চূড়া ক্ষতি হয়নি সেই কারণেই।

বিংশ কংগ্রেসে এই যেসব ঘটনা ও তথ্য আচমকা একসঙ্গে প্রকাশ পা তার অপ্রস্তুত বিস্ফোরণে অনেকে হতভম্ব বোধ করেছেন। অথচ প্রশ্ন বিবাদ বা মোহভঙ্গের নয়, বাস্তব কিছু ঘটনাকে বোঝার। কেউ কো ঢালাও রায় দিয়েছেন, এ সব ঐ ব্যবস্থারই দোষ। "বরং এই ব্যবস্থা আমাদের বাঁচিয়েছে।" বোফ্‌ফাকে জবাব দিয়েছিলেন জনৈক সোভিয়ে সাংবাদিক। সোভিয়েত পার্টি ও জনগণের অভাবিত সাফল্যে এবং আরে কিছু নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির যোগাযোগে অনবধানে ব্যক্তিপূজা গ উঠতে থাকলেও সামাজিক গতির অন্যবিধ একটা ধারা বারে বারে জানা দিয়ে এসেছে। আজ সোভিয়েত দেশ যে দিকে মোড় নিয়েছে, তা আকস্মি একটা ঘটনাচক্র নয়, তার উপকরণ জমে উঠছিল ; জমে উঠতে পেরেছি এই ব্যবস্থার সুবাদেই। ঠিক যে সময় পীড়নাধিক্যের শুরু ঠিক সেই সময়ে যে নতুন সোভিয়েত সংবিধান পাশ হয় (স্বয়ং স্তালিনেরই রচনা) তাতে গণতান্ত্রিক অধিকারের রক্ষাকবচ অর্জিত হয় জনগণের জন্য। যুদ্ধের আগে পার্টি কংগ্রেসে জ্‌দানভ পীড়নাধিক্যের প্রশ্ন তুলে তা বন্ধের প্রস্তাব পা করিয়েছিলেন। এগুলি কি ঐ অন্যধারার প্রতিফলন নয় ?

অবশ্যই মৃদু প্রতিফলন এবং যুদ্ধের ভেতর ও যুদ্ধের পরে স্তালিন পূ এমন একটা পর্যায়ে গিয়েছিল যে বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে তা আর একেবারে খাপ খাচ্ছিল না। স্তালিন যদি না মারা যেতেন—এ প্রশ্ন তুলে লাভ নে কারণ ইতিহাসের কারবার "যদি" নিয়ে না, "যা"—তাই নিয়ে। মোট কথা বিংশ কংগ্রেসেই প্রথম নয়। স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকেই এই নতুন মো নেওয়া কার্যক্ষেত্রে শুরু হয়ে গিয়েছিল। 'দুই নির্ধারক বছর' পরিচ্ছে

বোফ্‌ফা ধারাবাহিক বিবরণে দেখিয়েছেন, কীভাবে প্রথম শুরু হল কৃষি পরিস্থিতির কঠোর সমালোচনা ও নতুন অনাবাদী জমি হাশিলের ডাক, সংস্কৃতিক্ষেত্রে আলোড়ন, 'কমিউনিস্ট' পত্রিকায় ক্রমেই প্রকাশ পেতে থাকল পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের ওপর জোর, এবং অতঃপর পূর্বতন নির্যাতিতদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মালেনকভের পদত্যাগ, উর্ধ্বতন কমিটিতে মলোতভের সঙ্গে মতবিরোধ ও আন্তর্জাতিক নীতিতে নতুন ঝোঁক, কেন্দ্রীয় কমিটির জুলাই (১৯৫৫) অধিবেশনে মলোতভের প্রকাশ্য বিরোধিতা ও পরাজয়, শিল্পের অসন্তোষজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ও রিপোর্ট—কোনো সন্দেহ নেই যে নতুন ধারাটা নতুন কায়দায় ধীরে ধীরে জয়ী হয়ে উঠছিল ও এগুচ্ছিল একটা সুনির্দিষ্ট আকারের দিকে।

বিংশ কংগ্রেসকে সে কাজ করতে হয়। খ্রুশ্চভের রিপোর্ট যেভাবে ও যে-ভাষায় প্রকাশিত হয় সেটা বোফ্‌ফার কাছে রুচিকর না ঠেকলেও তিনি এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে সে সময়টা সে পরিস্থিতিটা একটা একান্ত অবজেকটিভ বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের সময় নয়—মূলত সেটা একটা সংগ্রামের রিপোর্ট, তার আঁকাড়া কোণগুলো যদি যথেষ্ট গোল না হয়ে থাকে তবে সেটা শুধু বোধগম্য না, সে অবস্থায় সম্ভবতঃ অনিবার্য।

এ বিস্ফোরণে শত্রুপক্ষ সানন্দে আশা করেছিল এবং মিত্রজনের সভয় আশঙ্কা ছিল রাশিয়ায় এবার একটা ওলটপালট হবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পার্টির প্রতি স্তরে আলোচিত হয়, সত্যি কথাগুলো খোলাখুলি বলা হয়, একই সাধারণ পার্টি কর্মীদের সভায় বক্তৃতা দেন পক্ষ প্রতিপক্ষ—এবং যাঁকে লোকে প্রায় দেবতা করে তুলেছিল তাঁকে মানুষ বলে পুনর্গ্রহণ করার আত্মিক যন্ত্রণা যতই হোক, জয়ী হল জীবন ; প্রায় বিনা-ভূমিকম্পে লোকে যে বিংশ কংগ্রেসকে মেনে নিতে পারল তার কারণ সোভিয়েতের মানুষ পেছন দিকে ততটা তাকায় না যতটা তাকাতে অভ্যস্ত সামনের দিকে এবং এই নতুন নীতিটাই নতুন যুগকে, নতুন জীবনকে প্রতিফলিত করতে পারছিল নিঃসন্দেহে।

আর একটা নতুন যুগ—পুরনো পঞ্জিকায় যা আঁটাছে এমন একটা নতুন পর্যায় যে সারা বিশ্বে এসে গেছে তার তাত্ত্বিক চেতনা পরে আরো সম্পূর্ণ হয়েছে ৮১ পার্টির দলিলে, এবং সম্প্রতি প্রকাশিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে।

এই প্রসঙ্গে খ্রুশ্চভের ব্যক্তিগত গুণাগুণের কথা না উঠে পারে না। পুরনো বহু জমকালো নামের বদলে কোথা থেকে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত এই অসুন্দর মজুরটি প্রতিনিধি হয়ে উঠল এই নতুন ধারার? উত্তরে একটা গল্প শুনুন। একটি সেলে আটক ছিল একজন সমাজতান্ত্রিক, একজন সোশ্যাল ডেমোক্রাট, একজন কমিউনিস্ট ও একটি বেঁটে ইহুদী। মাঝে মাঝে খাবারের প্যাকেট এলে তা সারা সপ্তাহ ধরে ঠিক হিসেব করে লোককে বেঁটে দেওয়ার মামুলী কাজটা নানা অজুহাতে কেউ নিলে না। অগত্যা সে ভার পড়ল বেঁটে ইহুদীটির ওপর। ইতিমধ্যে সকলে মিলে পালাবার জন্যে একটি সুরঙ্গ খুঁড়লে। কিন্তু কে আগে বেরুবে সুরঙ্গ দিয়ে, কেননা বেরলেই প্রহরীর গুলিতে প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে। এবারেও ভার পড়ল বেঁটে ইহুদীর ওপর। এবং এই ইহুদীটিই খ্রুশ্চভ। স্বভাবতই এটা গল্প, যদিও খ্রুশ্চভের নিজের বলা গল্প—কিন্তু একটা সত্যি এতে আছে। স্তালিন-পূজার কুফল সম্পর্কে অনেকেরই চেতনা এবং নতুন যুগের নতুন প্রয়োজন সম্পর্কে একটা ভাবনা থাকলেও ঝুঁকি নিয়ে লড়াইয়ের সামনে দাঁড়ান খ্রুশ্চভই। তাঁর এই একটা মস্ত সুবিধা ছিল যে তিনি রাজধানীতে ঘাঁটি গেড়ে আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতায় কখনো জড়াবার সুযোগ পান নি। তাছাড়া পশ্চিমী সাংবাদিকরা যা দেখে অনেক সময় অবাক হন, লোকটা কথা বলতে ভালোবাসে খুব, এবং আজীবন ও এখনো পর্যন্ত সোভিয়েত দেশের নানা অঞ্চলের নানা লোকের সঙ্গে কথা বলাবলি করার অপূর্ব সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক দ্বীপবেষ্টিত রাজধানী ও পার্টি শীর্ষের ভারিক্কি কামরায় যা সহজে পৌছত না, সোভিয়েতের সেই জীবন্ত বাস্তব সমস্যা, প্রশ্ন ও আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এই লোকটি ছিল ওতপ্রোত—তাছাড়া সংগঠনের এমন প্রতিভা ও উদ্যম, সাম্প্রতিক ইতিহাসে বোধ করি খুব বেশি দেখা যায় নি। তাই, অতি মার্জিত কানে খ্রুশ্চভের আলাপ সর্বদা মার্জনীয় বোধ না হলেও, ঈশ্বর করুন, দুনিয়ার মোড়ল মাতব্বর থেকে শুরু করে মুটে মজুর পর্যন্ত সর্বজনের সঙ্গে জমিয়ে আলাপ করার এই নেশাটা যেন ভদ্রলোকের না কাটে, এই আশা করেছেন বোফ্‌ফা।

বিংশ কংগ্রেসের পর চার বছর কেটেছে। এই চার বছরে সোভিয়েত দেশে ভূমিকম্প হবার বদলে সোভিয়েত দেশই ভূমিকম্প জাগিয়েছে সারা বিশ্বে। রকেট, স্পুৎনিক, গাগারিন, তিতভ—এ সব কথা উচ্চারণও আজ

বাহুল্য। তবু চার বছর আগে যেখানে মস্কোর লোকজনের সঙ্গে খ্রুশ্চভ প্রসঙ্গে কখনো নীরবতা, কখনো বিহ্বলতা বা বিরাগ লক্ষ্য করেছি আজ চার বছর পরে যদি ঠিক উল্টো অভিজ্ঞতা হয়, খবরের কাগজে প্রকাশিত খ্রুশ্চভের যুতসই এক একটা উক্তি নিয়ে যদি মেট্রোর গোটা বেঞ্চের লোকদের উল্লসিত হতে দেখি, "সাচচা মুঝিক" বলে স্বতঃস্ফূর্ত বাহবা শুনি সাধারণের, তবে তার কারণ শুধু ঐ বৈজ্ঞানিক বাহাদুরিই নয়—কারণ দেশাভ্যন্তরে এই চার বছরে এমন কতকগুলি সংস্কার, যার তাৎপর্য বাইরে তত স্পষ্ট নয়—যেমন চাষের পুনর্বিন্যাস, শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ, স্কুলের নবায়ন এবং সব দিক দিয়ে জীবনের একটা নতুন হাওয়া। খ্রুশ্চভ আজ সোভিয়েত মানুষের কাছে ভারী প্রিয়।

কিন্তু, প্রশ্ন করবেন উন্নাসিক, নতুন ব্যক্তিপূজার শুরু নয় কি তা? এখনো পর্যন্ত বলতে পারি, না, যদিও ওদেশে সাংবাদিকতার বিশেষ ধরনটা আমার কাছে সব সময় নিখুঁত ঠেকে না। কিন্তু তবু, না—কারণ মূর্তিপূজক শিবের মূর্তি ভাঙলেও চণ্ডী মূর্তি গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু মূর্তি পূজাকেই যদি ভাঙা হয় তবে তৃতীয় দেবতার আগমন সহজ নয়। এবং আশা করি, না—কারণ সম্প্রতি পড়লাম কজলভ প্রস্তাবিত ওদের পার্টির খসড়া গঠনতন্ত্রের সংবাদ। ব্যক্তি পূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, যৌথ নেতৃত্ব বজায় ইত্যাদি কথা ভুলে যাবার বদলে যতখানি সম্ভব সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থাই তা পড়ে দেখছি। এবং কিছুতেই না, কারণ সংবিধানই সব নয়—রাষ্ট্র প্রশাসনে ক্রমশই অধিকাংশ জনগণের অংশ গ্রহণই সর্বোত্তম গ্যারান্টি। এটা এক দিনের ব্যাপার নয়, নানা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সংগ্রামের ব্যাপার। এ সংগ্রাম যে ক্রমেই অবারিত হচ্ছে সে বিষয়ে স্বীয় অভিজ্ঞতায় আমি নিশ্চিত।

তাই খটকা লাগে, স্তালিন আমল সংজ্ঞা হিসাবে বাতিল হবার পরও বোফ্‌ফা কি সাংবাদিক চাঞ্চল্যপ্রিয়তার লোভেই বইটির নাম দিলেন খ্রুশ্চভ আমল?

একটি অভিনন্দনযোগ্য বই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কিছুকাল থেকে 'স্বপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড' সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের ওপরে কয়েকটি মৌল গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তাঁদের এই সাধু প্রচেষ্টার ফসলরূপে অন্তত চারখানি ভালো বই আমরা হাতে পেয়েছি। যেমন বিমলকৃষ্ণ সরকারের 'কবিতার কথা', অজিতকুমার ঘোষের 'নাটকের কথা', অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমালোচনার কথা' এবং সাধনকুমার ভট্টাচার্যের 'শিল্পতত্ত্বের কথা'। দেবীপদ ভট্টাচার্যের আলোচ্য বই 'উপন্যাসের কথা' এই তালিকায় আর একটি মূল্যবান যোজনা*।

উপন্যাস সাহিত্যের যে বিপুল ইতিহাস বেকার অর্ধেক জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে রচনা করে গেছেন, কিংবা যে বিরাট প্রয়াস রেখে গেছেন সেণ্ট্ স্বেরি—সম্ভবত প্রকাশকের নির্ধারিত্র পত্র-সংখ্যার শাসনেই সে দায়িত্ব গ্রহণ করা দেবীপদবাবুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও—চল্তি প্রশস্তির ভাষাতে নয়—বাঙালী সাহিত্য-পাঠকের দীর্ঘদিনের একটি অভাব 'উপন্যাসের কথা' অনেকখানি মোচন করল এ-কথা সানন্দে জানানো চলে।

হোমারের মহাকাব্য থেকে যাত্রা শুরু করে, আর্থারিয়ান রোমান্স আর 'আইস্ল্যাণ্ডিক সাগরে' পথ বেয়ে—মধ্যযুগীয় মূরবিজয় এবং প্রাচ্য-সাহিত্যের প্রতিফলনে—গিয়োভানি বোক্কাচ্চিয়োরও একশো বছর আগে কেমন করে ইতালীয়ান 'নভেলা'র অঙ্কুরে ইয়োরোপে কথা-সাহিত্য জন্ম নিল, সে ইতিহাস যেমন সুবিশাল তেমনি অসম্পূর্ণ গবেষণায় এখনো কুয়াশাচ্ছন্ন। তাই সঙ্গতভাবেই দেবীপদবাবু রেনেসাঁস যুগের অন্যতম সমুচ্চ চূড়া ফ্রাসোঁয়া র‍্যাবেলেই-কে দিয়েই তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন। মানুষ সম্পর্কে যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ এবং পীড়নকারী শাসনশক্তি যাজকতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের প্রতি উদ্যত অভিযোগ রেনেসাঁসের অন্যতম লক্ষণ, উপন্যাসের প্রথম বাস্তব-ভিত্তি নিঃসন্দেহে তারই ওপরে গড়ে উঠেছিল। বোক্কাচ্চিয়োর নভেলা

* **উপন্যাসের কথা**। দেবীপদ ভট্টাচার্য। স্বপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড।

সম্পর্কে কিছু পরিচিতি থাকলে মুখবন্ধটি হয়তো আর একটু স্পষ্ট হত, তবু র‍্যাবেলেই থেকে যাত্রারম্ভ মোটের ওপরে শোভন হয়েছে বলা যায়।

তারপর ইংরেজী, ফরাসী ও রুশ সাহিত্যের ধারায় মূলত উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উপন্যাসের যে পরিচিতি লেখক রচনা করেছেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও সুদীর্ঘ সুবিস্তৃত অধ্যয়ন এবং মননশীলতার ফল। এত অল্প আয়তনের মধ্যে এই ব্যাপক আলোচনা প্রাণহীন নামপঞ্জী এবং লেখকপঞ্জীতে পরিণত হওয়ার বিপজ্জনক সম্ভাবনা ছিল। লেখকের সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুসমঞ্জস জাগ্রত বুদ্ধি সেই দুর্বিপাক ঘটতে দেয় নি। কোনো যুগের বা কোনো কালের সাহিত্য-সৃষ্টিই যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস নিরপেক্ষ নয়, তা যে যুগ-মানসের অপরিহার্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শস্য, এই দ্বান্দ্বিক সত্যটি সম্পর্কে লেখক পূর্বাপর সচেতন ছিলেন। তাই 'রোক্সানা' এবং 'মোল ফ্ল্যাণ্ডার্স'-এর সামগ্রিক তাৎপর্যটি তিনি সঠিকভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। "Honesty is out of the question when starvation is the cause"—রোক্সানার এই স্পষ্টোক্তি অথবা নিজের অপরাধের সমর্থনে মোল ফ্ল্যাণ্ডার্সের হাহাকার: "Vice came in always at the Door of Necessity"—ইংরেজী উপন্যাসের প্রাগুষায় জীবনধর্মী এই শিল্প-পদ্ধতির মর্মকথা এদের মধ্য দিয়ে যে-ভাবে উচ্চারিত হয়ে গিয়েছিল, দেবীপদবাবু সে নির্দেশ বিস্মৃত হন নি। রেস্টোরেশন, ফরাসী-বিপ্লব আর চার্টিস্ট্ আন্দোলনকে পটভূমিতে রক্ষা করে, মানবতা এবং প্রগতির মানদণ্ডে সারভাঁতেস্ থেকে অস্কার ওইয়াইলড্ পর্যন্ত ইয়োরোপীয় সাহিত্যের একটি স্বল্পরেখ অথচ প্রাণস্পন্দিত বিচার ও বিবৃতি তিনি উপস্থিত করেছেন। সুনির্বাচিত বিশিষ্ট গ্রন্থের বিশ্লেষণে তাঁর আলোচনা হৃদ্য হয়ে উঠেছে।

বাংলা উপন্যাসের আদি-পর্বও মূল্যবান। উপেক্ষিত 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'কে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কয়েকটি সৎসাহসী সত্য মন্তব্য প্রকাশ করেছেন (যেমন 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারাম' প্রসঙ্গে—পৃঃ ১৭৬-৭৮), বাংলা কথা-সাহিত্যে ব্রাহ্ম-সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত করে রেখেছেন (পৃঃ ১৯৪)।

আধুনিক উপন্যাসের পরিচিতিতে লেখক একটু নিষ্করুণ। এই অংশের স্বল্পায়তন আমাকে পীড়া দিয়েছে। বোধ হয় পত্রসংখ্যার সীমাবদ্ধতাতেই মারিয়া রেমার্ক বাদ পড়েছেন, এরস্কিন কল্ড্ওয়েল্ আলোচিত অথচ

'লোনিগান'স্রষ্টা ফ্যারেল বর্জিত, হেন্‌রি মিলার, স্তেফান ৎস্থইগ্., আর্ন
ৎস্থইগ্ এবং ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কার সন্ধান পাই না—বুনিনের আলোচনায়
শ্রেষ্ঠ বই 'The Well of Days' অনুল্লিখিত। প্রসঙ্গত মনে প
তুর্গেনেভের প্রসঙ্গে 'রুদিন'ও এইভাবে বাদ পড়েছে—অথচ চরিত্রসৃষ্টির দি
থেকে বোধহয় বাজারভের পাশেই রুদিনের স্থান। সার্ত্রের ত্রি-গ্র
তৃতীয় বইখানিকে আমরা ইংরেজী অনুবাদে 'Iron in the Soul' নাম
পড়েছি, 'Troubled Sleep' নামে কি তার অন্যতর অনুবাদ হয়েছে ?

কিন্তু এগুলি নিছক খুঁটিনাটি মাত্র। দেবীপদবাবুর মূল্যবান গ্রন্থ
গুরুত্ব এতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। সাধারণ বাঙালী পাঠক তাঁর আলোচন
মাধ্যমে বিশ্ব-সাহিত্য সমুদ্রের গর্জন শুনবেন এবং সেই সমুদ্র অবগাহনে তাঁদে
আগ্রহ জাগবে। তত্ত্বানুরাগীর পক্ষে বইখানি 'Ready Reference'-এ
ভূমিকা নেবে এবং ছাত্রেরা এর সাহায্যে প্রভূত উপকৃত হবেন। স
সাহিত্যিক ভাষায় এবং সুস্থ বলিষ্ঠ বিচারবুদ্ধিযোগে 'উপন্যাসের কথা' রচ
করে দেবীপদ ভট্টাচার্য সমগ্র বাঙালী পাঠকের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অ
করলেন।

এই বইখানিতে তাঁর যে শ্রমশীলতা, পাণ্ডিত্য ও রসবোধ ল
করা গেল, তাতে অতঃপর তাঁর কাছে উদারতর কোনো প্রকাশকে
সহযোগিতায় একখানি অকুণ্ঠ বিস্তৃত বই আমরা নিশ্চয়ই দাবি কর
পারি।



পরিচয়

ভাদ্র । ১৩৬৮

সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়